নানা নিবন্ধ

সূচীপত্র

রত্নখোঁজা

তিনটি গাছ

শান্তিনিকেতন

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

মানুষ তৈরি

ওস্তাদ

খ্রীস্ট-উৎসব

গান্ধীজির সবুজ পাতা

অবনীন্দ্রনাথের একশো বছর

বিবিদিকে

মর্মর প্রাসাদ

ভুতনি

স্বেন হেদিন

সরোজিনী নাইডু

এক ওস্তাদ

সুখলতা

পুণ্যব্রতা

রত্ন খোঁজা

ছোটবেলায় কত যে রত্ন খুঁজেছি তার ঠিক নেই। শিলঙে ভাড়াবাড়িতে আরেকটি বাড়তি ঘর তৈরি হল। তার ভিত খোঁড়া হচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি, পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে লাগা ভিতটি বেশ খানিকটা গভীর করে খুঁড়তে হল। আমরা কজনা ওত পেতে রইলাম, কখন কোদালের ঘায়ে ঠুন্‌ন্‌ শব্দ হবে। মাটির মধ্যে থেকে টেনে বের করা হবে, সীসে দিয়ে মুখ বন্ধ করা একটা ঘড়া, ঘড়ার মুখ যেই-না খোলা যাবে, ভিতর থেকে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেরিয়ে আসবে রাশি রাশি সোনার মোহর। বলা বাহুল্য একটা বড় পিঁপড়ের বাসা ছাড়া কিছুই বেরোয় নি। কিন্তু বাসাটিও মন্দ ছিল না।

মাটির উপরে ঘাসের মধ্যে হয়তো-বা খুদে একটা গর্ত ছিল। আমরা লক্ষ্য করার আগেই তাকে মজুরেরা কুপিয়ে শেষ করে ছিল। ভিতরে থাকে থাকে অসংখ্য গলি-ঘুঁজি, ছোট-ছোট কুঠরি, তাতে থাকে থাকে ডিম। সেই ডিম মুখে তুলে বড় মাথা পিঁপড়েগুলোর সেকি ছুটোছুটি। তা ছাড়া ছোট-ছোট একরকম পোকাও ছিল। বড়রা কেউ কেউ বললেন, ঐ নাকি ওদের গরু, ওর গা থেকে রস ওরা নাকি খায়।

আরেকটু বড় হয়েও ঐ রত্ননেশা যায় নি। ছোটনাগপুরে পুজোর ছুটিতে গিয়ে ছোট নদীর তীরের বালিতে কত রত্ন খুঁজেছি। শুনেছিলাম নদীর জলে সোনার গুঁড়ো, মণি-মাণিক্যের টুকরো ভেসে এসে অনেক সময়ে বালিতে আটকে থাকে। পেয়েছিলাম শুধু সাদা গোল একটা নুড়ি, তার ভিতরে কেমন করে এক চামচ জল বন্ধ হয়ে আছে। নুড়ি

ঝাঁকালে সেটি নড়ে। আর পেয়েছিলাম—পাথর হয়ে যাওয়া কোনো ছোট জানোয়ারের একটুখানি চোয়ালের হাড়।

বড়-বড় গাছ ছিল পাহাড়-দেশে। কত গল্প শুনতাম ঈগল পাখির কিম্বা দাঁড়কাগের বাসা খুঁজলে নাকি চুরি করা গয়না পাওয়া যায়। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেবলই তাকিয়ে দেখতাম কোথাও যদি পাতার ফাঁকে চক্‌চকে কিছু দেখতে পাই। দেখলামও একদিন ঝাউগাছের মগডালে। এক দলা সোনালী কি যেন। রোদ পড়ে তাই থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। মালিকে ধরে বলে-কয়ে অনেক কষ্টে রাজি করানো হল। সে অনেক কষ্টে নামিয়ে নিয়ে এল এক গাছের আঠা। বড়রা বলল তাকে রজন বলে। তার গায়ে ধুপধুনোর গন্ধ মাখা।

অনেকে বলত লোকের বাড়ির চিলেকোঠায় বহুদিনের পুরোনো জিনিস জমা থাকে। তার মধ্যে গুপ্তধনের নকশা পাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। তাও খুঁজেছিলাম। রাশি রাশি ভাঙা আসবাব, ছেঁড়া জামা-কাপড়, মলাট খোলা বই, পোকায় কাটা খাতাপত্রের মধ্যে একটা হলদে হয়ে যাওয়া খামের মধ্যে ছোট্ট একটা চিঠি পেলাম। আমার সন্ন্যাসী দাদামশাই আমার ছোট্ট মাকে লিখেছেন, 'ভালবাসা জেনো।'

তিনটি গাছ

বারো বছর বয়স পর্যন্ত শহরের প্রভাবের বাইরে একেবারে প্রকৃতির নিজের রাজ্যে কাটিয়েছিলাম। তাকে তখন এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। সে তার হাড়-কাঁপানো শীত, তার মন-ভোলানো বসন্ত আর গ্রীষ্ম, তার আশ্চর্য বর্ষা আর ফলপাকানো শরৎ-হেমন্তের কুয়াশা, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোট-ছোট বন্যার সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখি, জোঁক, সাপ, শোঁয়াপোকা, চাম্‌চিকা, বাদুড়, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে আমাদের চার দিকের দৃশ্যমান আর অদৃশ্য জগতে এমন ভিড় করত যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখবার জায়গা খুঁজে বের করাও মাঝে মাঝে মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কেবলই মনে হত এটা ওদেরই জায়গা, আমাদের একটু দেখেশুনে চলতে হবে।

যেই-না এই কথা মনে হওয়া, অমনি দেখলাম আমরাও দিব্যি ওদের রাজ্যে জায়গা পেয়ে গেছি। তার উপর বড়রা কেবলই সাবধান করে দিতেন—ঠ্যাং নেই, লম্বা গড়নের—ওগুলি সাপ, কামড়ালেই মানুষ মরে যায়, কাছে যাস নি। মেটে রঙের দুটো শিং-ওয়ালা পিঠে শামুক, যেখানে যায় চট্‌চটে দাগ টেনে যায়—ওকেও এড়িয়ে চলিস। আর খবরদার ব্যাঙের ছাতার ধারেকাছেও যাবি না। বিলেতে প্রতি বছর বহু লোক নাকি ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মরে যায়, তা ছাড়া ওতে হাত দিলেই হাতে ঘা হয়। এই-সব সাবধানী কথা কানে নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের ঠিক মাঝখানে আমরা বাস করতাম।

গাছপালাগুলি ছিল আমাদের বন্ধু—যেমন তাদের স্নিগ্ধ ছায়া, তেমনি মিষ্টি তাদের ফল, আর সব চেয়ে মনোহর তাদের ডালপালার রহস্য। কত পাখির বাসা, কত অদ্ভুত কোটর, কত আশ্চর্য পোকার গুটি, কত সুগন্ধি আঠার টুপ্‌লি। একবার গাছে চড়লে আর নামতে ইচ্ছা করত না।

সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আমাদের বাড়ির হাতার মধ্যে তিনটি বড়-বড় ন্যাসপাতি গাছ। সেগুলিকে সারা বছর ধরে দেখে দেখে আমাদের আশ মিটত না। কলকাতা থেকে মাসি গেলেন, তাঁকে ফলের বাহার দেখিয়ে বললাম—কলকাতায় নাকি তোমরা পয়সা দিয়ে এ-সব ফল কেন, তাও অনেক ছোট, অনেক শুকনো, অনেক কম মিষ্টি? মাসি নাক সিঁটকে বললেন—'দূর এগুলিকে আবার ন্যাসপাতি বলে নাকি, এই ঢাউস বড়, কামড়ালেই রস গড়ায়, জামায় লাগলে তার দাগ ওঠে না, চিবুতে ক্যাচ্‌-ক্যাচ্‌ করে। আসল ন্যাসপাতি দেখতে চাস, কলকাতার মার্কেটে যাস। কেমন ছোট, হলদে, লম্বাটে গড়ন, পাকলে নরম তুল্‌তুল্‌ করে। এগুলি আমাকে দিলেও খাব না।' তাঁর দেখাদেখি তাঁর মেয়েও বলল—'ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা, দিলেও খাব না।' আমরা এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে ভালো করে কোনো উত্তর দিতেও পারি নি। তবে সত্যিই যে খেতেন না, তাও নয়। প্রত্যেক বছর ঐ গাছে ফল হত, কখনো বাদ যেত না। পঞ্চাশ বছর পরেও আজ পর্যন্ত ঐ তিনটি ন্যাসপাতি গাছ আমার মনের মাটিতে তেমনি উজ্জ্বল সরস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লেখা তাদেরই বিষয়ে।

যতদূর মনে হয়, গাছগুলির গা খুব মোলায়েম ছিল না। ওখানকার

উচ্চতা ছিল পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি, শীতকালে এত ঠাণ্ডা হত যে, ছোট-ছোট ঢেউসুদ্ধ অনেক নদী-নালা জমে যেত। শুধু যেগুলির স্রোত বেশি সেগুলি জমত না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইত। বেজায় কষ্ট হত। কষ্টটা শুধু শরীরের ছিল না, গাছগুলির অবস্থা ভেবে মনেও বড় কষ্ট হত। মাছগুলি বরং অনেক বেশি আরামে থাকত। নদী-নালা ছোট-ছোট পুকুরের উপরে হয়তো জল জমে এক পরত বরফ হয়ে থাকত। তার নীচে দিব্যি বরফের ছাদের তলায় মাছেরা আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াত—এ কথা আমাদের পাহাড়ী ধাই-মারা প্রায়ই আমাদের বলত।

ন্যাসপাতি গাছগুলির কথা আর কি বলব। শীতের হাওয়া লাগতেই তাদের পাতাগুলি প্রথমে ফিকে সবুজ, তার পর হলুদ, তার পর পাট্‌কিলে, লালচে, কোনো কোনো গাছে কুচ্‌কুচে কালো হয়ে গিয়ে ঝরে ঝরে পড়ত। গাছের তলায় শুকনো পাতাগুলি স্তূপাকার হয়ে থাকত। এমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুত যে, স্পষ্টই বোঝা যেত ওরা সব মরে গেছে।

শুক্‌নো ঘূর্ণী হাওয়ায় মরা পাতাগুলি বাগানের ঘাস-জমিতে উড়ে উড়ে বেড়াত, চার দিক নোংরা দেখাত। মালি সেগুলিকে লম্বা বাঁশের হাতল লাগানো কাঁটা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এখানে-ওখানে—যেখানে হাওয়া লাগত না, এমন জায়গায় জড়ো করত। তার পর সবগুলিকে একসঙ্গে করে বাড়ি থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড এক ঢিপি বানাত। সন্ধ্যার আগে তাতে আগুন লাগানো হত। দেখতে দেখতে সে আগুন উঁচু হয়ে জ্বলে উঠত। মালি আর অন্য চাকরেরা বালতি করে জল, গাছের ডাল ইত্যাদি নিয়ে তৈরি থাকত, যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে আর আমরা আগুনের যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, ততটা এগিয়ে তাকে ঘিরে থাকতাম; কান ভরে যেত আগুনের গানে। সে গান, কাঠ-ফাটা আগুনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি নয়, চাপা একটা গন্‌-গন্‌ সুর। এখনো সে আমার কানে লেগে আছে। আর কি সুন্দর গন্ধ। পাকা ফল, শুক্‌নো খড়, কিম্বা মিহি একটু কস্তুরির গন্ধ নাকে এলে—সে গন্ধের কথা মনে পড়ে।

যখন সারা মুখ আর শরীরের সামনের দিকটা তেতে আগুন হয়ে যেত, তখন সরে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম। সকলের মুখ লাল, চোখ

চক্‌চকে। তার পর সব পাতা পুড়ে ছাই হয়ে যেত, আগুনের হল্‌কা নেমে যেত, তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছাইগুলির মধ্যে লাল্‌চে রঙ দেখা যেত। রাত বাড়লে আমাদেরও ঘরে যেতে হত। সামনেটা গরম, পিঠটা ঠাণ্ডা, সারা গায়ে পোড়া পাতার মিষ্টি গন্ধ মিশে যখন খেতে বসতাম, মনটা যেন কেমন করত।

আস্তে আস্তে ন্যাসপাতির ডাল একেবারে ন্যাড়া হয়ে যেত। নীল আকাশের গায়ে হাত-পা মেলে কতদিন গাছগুলি কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। শীত এগুতে থাকত। ন্যাসপাতি গাছ তাদের এবড়ো-খেবড়ো ছালে ঢাকা গুঁড়ি আর ডালপালা নিয়ে শীতের শেষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। ডিসেম্বর কাটত, জানুয়ারি কাটত, ফেব্রুয়ারিতে খুব নজর করে দেখলে মনে হত—খোঁচা খোঁচা ডালপালার খাঁজে খাঁজে আর ডগায় যেন খোঁচার বদলে একটুখানি গোলভাব দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারির শেষে আর কোনো সন্দেহই থাকত না। ডালপালা আর গাছের গুঁড়িকে কালো দেখাত, কিন্তু খাঁজের আর ডালের আগায় যেন লাল্‌চে আভা। আরো কিছুদিন কাটত। মার্চের গোড়ায় আমাদের লম্বা শীতের ছুটি ফুরিয়ে যেত। রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তখন আর চিনতে ভুল হত না। ছোট-ছোট ডালের আগায় গোছা গোছা কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে। প্রথমে ইঁটের মতো শক্ত, ছোট-ছোট গুটি যেন। কিন্তু ক্রমে যখন চার দিকে বসন্তকাল সাড়া দিত, শুকনো ঘাসে সবুজ দেখা যেত, তার মধ্যে সাদা গোলাপী ক্রোকাসফুল ফুটত, তখন কুঁড়িগুলিও যেন আগ্রহে অধীর হয়ে উঠত।

হয়তো মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের গোড়ায় হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, রাতারাতি ন্যাসপাতি গাছের ন্যাড়া ডাল সাদা ফুলের থোপায় ঢেকে গেছে। তখন ফুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না। সে ফুলের তুলনা হয় না, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, মনের সম্পদ হয়ে থাকে সে। তার মৃদু গন্ধ গাছতলায় না গেলে টের পাওয়া যায় না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুটে ফুটে সব ফুল যখন ঝরে পড়ে যেত, তখনো মন খারাপ করবার অবকাশ থাকত না। দেখতাম খুদে-খুদে গুটির মতো ছোট্ট-ছোট্ট ফল। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে। কেউ যদি-বা সাহস করে গাছে উঠে টিপে দেখত, বলত—উঃ, পাথরের

মতো শক্ত। আরো সাহস করে যদি কামড়ে দেখত, বলত বেজায় কষা।

অবশ্য দুঃখ করবার কিছু থাকত না। কারণ এই সময় আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। গাছে আরো অনেক কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে, ছোট-ছোট ডালের থেকে একটু লম্বাটে গড়নের থাক থাক দাগকাটা কুঁড়ি। দেখতে দেখতে সেগুলিও খুলে যেত। দেখতাম হাজার হাজার কোমল কচি পাতা। চোখের সামনে পাতাগুলি বড় হয়ে সমস্ত কচি ফলকে আড়াল করে ফেলত। তখন গাছটার আরেক রকম বাহার হত।

কিন্তু অনেকদিন ধরে যেন আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ত না। খুব ভালো করে নজর করলে অবশ্য দেখা যেত খুদে ফলগুলি কেমন বাড়ছে। অনেকগুলি ছোট অবস্থায় খসে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকত। গাছের মাথার উপর দিয়ে গ্রীষ্ম কাটত, বর্ষা কাটত। আর সে কি প্রবল বর্ষা! কিন্তু পাতার ছাতার নীচে আমাদের ন্যাসপাতি ফলগুলি নিরাপদেই থাকত।

তার পর বর্ষাও শেষ হয়ে যেত। গাছ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো সবুজ, আরো সতেজ হয়ে উঠত। তখন আমরা খেয়াল করতাম গাছের ডালপালাগুলি মাটির কাছে এসেছে। তাকেই বলে ফলের ভারে নুইয়ে পড়া। শরৎকালের ফল দেখতে বেশ বড়, লোভনীয়ও বটে। কিন্তু তাকে বাদুড়েও খেত না, পাখিতেও ঠোকরাত না। শরতের শেষে ফলে হলদে রঙ ধরত, সুগন্ধে চার দিক ম'-ম' করত। রাতে বাদুড়েরা মহা ঝগড়াঝাঁটি করত, দিনে পাখিরা ঝাঁক বেঁধে আসত। আমরা তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফল খেতাম। পাখিতে ঠোক্‌রানো, বাদুড়ে আচড়ানো ফলগুলিই সব চেয়ে মিষ্টি লাগত। একটুও ঘেন্না হত না। জখম হওয়া জায়গাটুকু কেটে ফেলে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাতে ধুপ করে শব্দ হত। বুঝতাম বড় একটা ফল পেকে পড়ে গেল। সকালে অমনি ছুটোছুটি। পৃথিবীতে এত আনন্দ কম জিনিসেই পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন

প্রত্যেক মানুষের দুটি পরিচয় থাকে, একটি তার কাজের ক্ষেত্রে আর একটি তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে। একটিকে চোখে দেখা যায়, ধরা ছোঁয়া যায়, ভাঙা গড়া যায়, আর একটি থাকে নিভৃতে গোপনে, হঠাৎ তাকে খুঁজে পাওয়া যে-সে লোকের কাজ নয়, এ দিকটি চিরন্তন অবিনশ্বর, এর পরিবর্তন হয় না।

লোকে যখন দুঃখ করে বলে সে শান্তিনিকেতন আর নেই, এখন আর একে চিনতে পারার জো নেই, তখন কি তারা ঐ প্রথম পরিচয়টির কথাই ভাবে? যখন এখানে কিছু ছিল না, ধূ ধূ করত ঢেউ খেলানো শুকনো খরা জমি, বেঁটে বুনো খেজুর আর ফণিমনসার ঝোপ ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না, তখন পথের ধারে দুটি ছাতিম গাছের সবুজ অভ্যর্থনা দেখে একজন মনীষীর মন মুগ্ধ হয়েছিল। তার পরে কোপাই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

ছাতিম গাছের কাছে শান্তিনিকেতনের সাধনাশ্রমের দোতলা বাড়ি হল, কুয়ো হল, বাগান হল, ক্লান্ত ভক্তজনরা দুদিনের জন্যে সেখানে আসতে লাগলেন, প্রাণ জুড়োবার আশায়? নতুন একটা অশান্তিময় শতাব্দীর শুরুতে সেখানে একজন কবি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন হবে না, এ কথা পরমভক্তরাও নিশ্চয়ই আশা করেন না।

শান্তিনিকেতন গৃহটিকে ঘিরে দু-তিনটি পাকা বাড়ি আর অনেকগুলি মাটির ঘর হল, বড় কুয়ো হল, ছেলেদের জন্যে পাকশাল হল, বিদ্যালয়ের আপিস ঘর হল। গ্রন্থাগার হল, শিক্ষকদের ঘরবাড়ি হল, গাছে গাছে শুকনো মাঠের মধ্যে যেন একটি কুঞ্জবন তৈরি হল।

এরকম আবার ছিল কবে? ছাপাখানা হল, বিজলীর কারখানা হল, দেখতে দেখতে দোতলার ছোট বাড়ি 'দেহলী' থেকে কবির বাস উঠে গেল, একতলার কুটীর 'কোণার্কের' পাশে রাজবাড়ির মতো 'উত্তরায়ণ' হল। উত্তরায়ণের সামনে টেনিস্ খেলার প্রাঙ্গণ হল, গোলাপ বাগান হল,

জাপানী বাগান হল, পিছনেও সৌখীন গাছ-গাছড়ার আমদানী হল। সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন বাড়িতে চার দিক ছেয়ে গেল, উত্তরায়ণের পর কোণার্কের ভোল বদল, তার পর শ্যামলী, তার পর পুনশ্চ, তার পর উদীচী। কেবলই পরিবর্তন, কেবলই এগিয়ে চলা।

নিশ্চলতা কবির সইত না। কোনো কিছু একভাবে থাকবে এ তিনি চাইতেন না। ঘরের আসবাব এ কোণ থেকে ও কোণে, এধার থেকে ওধারে নিতেন। এ ঘরের বাস তুলে ও ঘরে যেতেন, সেখান থেকে সে-ঘরে। সব ঘর ফুরিয়ে গেলে অন্য বাড়িতে যেতেন। বাড়ি ফুরুলে নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতেন। কখনো নিরামিষ খেতেন, কখনো আমিষ, কখনো হোমিওপ্যাথি করতেন কখনো বায়োকেমিস্ট্রি।

আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়ে পরে আবার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে বলতেন সব হোক বাংলায়, ইংরাজিতে কেউ যেন একটি দুটি চিঠিও না লেখে, পরে আরো দৃষ্টি ফেরালেন, পৃথিবীকে ডাক দিলেন, তখন আর বলা গেল না শুধু বাংলা চলবে। হিন্দী ভবন, চীনা ভবন হল। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্বভারতী। কলাভবন, সংগীতভবন হল, গ্রামোন্নয়ন, শিল্পবিদ্যালয়, সব হল। আশ্রমের সে রিক্ত নগ্ন রূপ গেল ঘুচে।

যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা একদা 'স্বদেশী সমাজে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার দীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই বিদ্যালয় এখন সরকারি নিয়মে সরকারি অর্থে চলেছে। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ নেই, এ তো আমাদেরই স্বদেশী সরকার, এ টাকাও আমাদেরই দেশের টাকা।

নিয়ম-কানুন, পরীক্ষা, দপ্তর, এ-সবও অনিবার্য। দেশের সেই নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয়তার দিন শেষ হয়েছে। যখন লোকে টাকা পয়সা রোজগার করার কথা ভেবে লেখাপড়া শিখত। সংস্কৃতি এখন আর সৌখীনদের একচেটিয়া বিলাসের বস্তু নয়, এ আমাদের দেশেরই সামগ্রী। যাদের করে যেতে হবে, এ তাদেরও। তাই ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, পাঠক্রম, দপ্তর। কবি একদিন অনিচ্ছা থাকলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠানো প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদন করেছিলেন, আজকের ব্যবস্থাতে যে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন, তাই বা কি করে বলা যায়?

তবে ক্ষুণ্ণ হয়তো খানিকটা হতেন, কারণ যেখানে তিনি

চেয়েছিলেন প্রাণের জোয়ারে সব বাধা ভাসিয়ে দিতে, সেখানেই সব কিছুকে নিয়মনিগড়ে বাঁধা হচ্ছে। প্রাণের অবাধ গতি না থাকলে মানুষের চারা বেশি নীচে শিকড় নামাতে পারে না। ঐ যে প্রত্যেক মানুষের দুটি পরিচয়ের কথা বলা হল, নিয়ম-কানুন তার প্রথমটিতে খাটে, দ্বিতীয়টি সব নিয়মের বাইরে।

কবি বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন, সেইজন্যই একদিন তরুণী স্ত্রী ছোট শিশুদের সুদ্ধ জোড়াসাঁকোর আরাম থেকে টেনে এখানকার কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। তবে কৃচ্ছ্র সাধনায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্থাভাবের জন্য, সেটি হয়েছিল অনিবার্য। গান্ধীজির সঙ্গে এ বিষয়ে কবির মতভেদ ছিল। কবি চাইতেন ছেলেরা অনাড়ম্বর সরল জীবন-যাপন করবে, শরীরকে কর্মঠ ও অনলস করে তুলবে, কিন্তু অতিরিক্ত শারীরিক কষ্ট সইতে হলে স্বাস্থ্য হবে মন্দ আর মনের বিকাশ হবে ব্যাহত। সদাই যদি ছেলেরা ভাবে কিসে এই কষ্টটুকুর খানিকটা লাঘব হয়, তা হলে উন্নত চিন্তা করবে কখন?

এখন দেখা যায়, ঘরে ঘরে আলো, পাখা, নতুন নতুন অট্টালিকা, হলঘর, প্রদর্শশালা, এ সবেই যে কবির আপত্তি হত তাও বলা যায় না। তবে বেশি আড়ম্বর যে তাঁর অভিপ্রেত ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার এও সত্যি যে, যেখানকার যা যোগ্য সে বিষয়েও কবি সচেতন ছিলেন। বিদেশ থেকে আগত অতিথি ও কর্মীদের যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টি ছিল।

এখন শান্তিনিকেতনে গেলে আবার একটা নবীনের আভাস পাওয়া যায়। বেড়া তুলে, গাছের অন্তরাল ঘুচিয়ে, একটা মুক্তির নিশানা দেওয়া হচ্ছে। রুক্ষ অসুন্দর জমিকে ঘাসে ঢেকে ফুলের চারা লাগিয়ে সুন্দর করা হচ্ছে। পুরোনো বাড়ি-ঘর সংস্কার করে বিদ্যাদানের কাজে লাগানো হচ্ছে, কবির স্মৃতিরক্ষার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

একবার উত্তরায়ণের বেষ্টনীর মধ্যে গেলে এই কথাই বার বার মনে হবে। 'দেহলী' হয়েছে শিশুদের পাঠশালা। তালগাছ ঘিরে মাটির বাড়ি 'তালধ্বজ' হয়েছে মেয়েদের কারু-শিল্পালয়।

যে বাড়িতে কেউ বাস করে না সে বাড়ি ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, এ কথা কি সত্যি? শান্তিনিকেতনের এই-সব পুরোনো বাড়িতে

আর প্রায় কেউই বাস করে না, সব তক্ তক্ করছে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ে না। কুটো পড়লেই লোকে তুলে ফেলে দেয়, কোন বাড়িতে কোন ঘরে কি হবে দপ্তর থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। যেখানকার চারি দিক ছেলেমানুষদের কলকণ্ঠে ভরা, সে কি কখনো প্রাণহীন হতে পারে। বিদ্যাদানের কাজ যেখানে চলে, তার নিজস্ব একটা প্রাণ থাকে।

এখনো এখানকার গাছতলায় ক্লাশ বসে, সংগীতভবনে দলে দলে ছেলেমেয়েরা গান শেখে, খেলার মাঠে ছেলের ভিড়, ঘণ্টাতলায় অষ্ট-প্রহর ঘণ্টা বাজে, ব্রতীবালকরা সারি বেঁধে হেঁটে চলে, চাঁদনি রাতে এখনো চড়িভাতি হয়। প্রাণহীন বলা যায় কেমন করে।

তবে প্রাণের কথা বলতে গিয়ে সব মানুষের ঐ দ্বিতীয় পরিচয়টির কথায় এসে পড়তে হয়। কবি চেয়েছিলেন দুটি ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দিতে যা ছিল মনের জিনিস, তার জন্যে কাজের ঘরে ঠাঁই করে দিতে, যাতে দৈনন্দিনের গ্লানি লাগে তার মধ্যে আদর্শের রঙ ধরিয়ে দিতে। সে আদর্শ চিরন্তন, মুনি-ঋষিরা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তার নাম সত্যম শিবম্ সুন্দরম্।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

শান্তিনিকেতনে এক বন্ধু এসে বললেন, "শুধু মানুষদের দোষ দেওয়া কেন? প্রকৃতির মধ্যেই যা জিঘাংসা—দেখলে শিউরে উঠতে হয়। চোখের সামনে দেখলাম, বুগানভিলিয়া লতায় জাল বুনে সাদা-কালো নকশাকাটা মাথাওয়ালা মাকড়সা পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি জালে যা আটকাচ্ছে, তাকেই ধরে চুষে খেয়ে ফেলছে! এমন সময় একটা হলদে-কালো বোলতা এসে ওর পিঠের উপর বসল। মাকড়সাটা বোধ হয় হকচকিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। বোলতা তার ধারালো মুখ দিয়ে কুট্ কুট্ করে মাকড়সার আটটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়ে সুপুরির মতো শরীরটাকে দিব্যি তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল! বীভৎস আর কাকে বলে!"

প্রথমটা সকলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। তার পর মনে পড়ল ঐ মরণ-যজ্ঞের পাশেপাশেই বাঁচবার কি আকুল সাধনা। আমাদের পাশের বাড়িতে কয়েকবছর কবি অন্নদাশঙ্কর রায় সপরিবারে থাকতেন। ওঁরা লোক বড় ভালো। বাড়ির চার দিকে জন্তুজানোয়ারের হাট। তাও কিছু নামকরা বিদেশ থেকে আমদানী করা সৌখীন জানোয়ার নয়, তবু তাদের আদর কত। ঘরে-বাইরে সাদা, কালো, পাটকিলে, পাঁচমিশালি পাতিবেড়াল গিজ্‌গিজ্‌ করছে। ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচায় রুগ্ন পায়রা। চেয়ারে মুরগি বসা। নেড়ি কুকুরদের দু-বেলা ডেকে এনে খাওয়ানো হত। দেখে দেখে মানবসমাজের উপর আস্থা জন্মাল। মাসকাবারে একবার করে শান্তিনিকেতনে যেতাম। সারা মাস তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। কিন্তু সব দিন তো আর একভাবে যায় না। কয়েক বছর এভাবে কাটবার পর কবি হঠাৎ ওখানকার বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এই কয়েক বছরে ওঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। চলে আসাতে বেশ বড় একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হতে লাগল।

পরের বার শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি দরজার বাইরে তালা ঝুলছে, চার দিক খাঁ-খাঁ করছে। ফটক হাঁ করে খোলা, গোরু-ছাগল ঢুকে গাছ খাচ্ছে। মনে পড়ল, একবার দেখেছিলাম কোন এক ফাঁকে ওঁদের বাড়িতে চারটে গাধা ঢুকে ফুলের চারা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কবি বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। গাছ খাওয়া দেখে ব্যাকুল হয়ে এক ছড়া করবীফুল ছিঁড়ে নিয়ে ওদের গায়ে মৃদু ঝাপটা দিতে লাগলেন। ওরা অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করল না, যতক্ষণ না ওঁদের বাড়ির চাকর ডাণ্ডা নিয়ে হৈ-হৈ করে তেড়ে এল। যে নেড়িকুকুরগুলি বাড়ির সামনের মাঠে অন্য জানোয়ার নামলেই মহা সোরগোল তুলত, আজ ওবাড়ির ত্রিসীমানায় তাদের কাউকে দেখা গেল না। কোথায় গেল পায়রা, মুরগি, বেড়াল-কুল?

তাদের দেখা না পেয়ে মন বড়ই খারাপ ছিল। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রাঁধবার লোক একটা ভাঙা পেয়ালা এনে বলল, "বেড়ালে ভেঙেছে।" আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, "কোথায় বেড়াল?" সে বলল, "তাড়া দিলেও সাড়া দেয় না।" এর আগেও বেড়াল এসে ডোঙার ঢাকনি ভেঙেছিল। সন্দেশের বাক্স মাটিতে ফেলে কতক খেয়ে, কতক

খাবলে-খিমচে; বাকি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সেগুলি নেড়ি কুকুরেরা প্রসাদ পেয়েছিল। সে-সব সুখের দিনের কথা কেবলই মনে পড়তে লাগল।

রাতে চোখে ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল কোথায় যেন করুণ সুরে বেড়াল কাঁদছে। থাকতে না পেরে দু-একবার দরজা খুলে দেখেও এলাম। কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম তবে কি যারা ওবাড়িতে অত সুখে ছিল, তাদের কথা ভেবে ভেবে ঐরকম কল্পনা করছি।

সকালে উঠে বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম কেউ কোনো ডাক শোনে নি। মালি বলল একটা দুষ্টু হুলো নাকি মুখুজ্জেদের মুরগির ডিম ও বাচ্চার লোভে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, কিন্তু জাল দিয়ে ঘেরা ঘরে ঢুকতে পারে না, ও তারই হতাশার ডাক। রাঁধবার লোক বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ও-হুঁ পেয়ালাও ভেঙেছে।"

সারাদিন নানান কাজে কেটে গেল। রাতে যেই-না চার দিক নিঝুম হয়ে এল, অমনি শুনলাম বেড়াল কাঁদছে। পরদিন অনিচ্ছুক লোকজনদের দিয়ে আঁতিপাতি বেড়াল খোঁজালাম। কোথাও কিছু নেই। মালিরা একটু ভড়কে গেছে দেখলাম। বার বার বলতে লাগল, "কি জানি, ওনারা তো নানান রূপ ধারণ করে—শুনেছি। ভয় লাগে। একটা পুজা-টুজা লাগালে হয় না?"

সে রাতেও বেড়ালের কাতর ডাকে ঘুম হল না। সকালে উঠেই আর সইতে না পেরে খালি বাড়ির পশ্চিমে ইন্দ্রাণীদের বাড়ি গেলাম। "হ্যাঁরে, তোরা রাতে বেড়ালের ডাক শুনতে পাস?"

ইন্দ্রাণী হাতে চাঁদ পেল, "তুমিও শোন নাকি? আজ চার দিন আমি ঘুমোতে পারি না, আর ছেলেরা বলে নাকি আমার মনের ভুল! কি করা যায়, মাসিমা?" জিজ্ঞাসা করলাম, "ও-বাড়ির চাবি কোথায়?"

"সুধাকান্ত দাদার কাছে।"

তখুনি চিরকুট লিখে মালিকে পাঠালাম তাঁর কাছে। মালির সঙ্গে রিক্শ চেপে চাবি হাতে রুগ্ন সুধাকান্ত দাদা নিজেই এলেন। বললেন, "তোমরা কি খেপলে নাকি? পাঁচ দিন হল আমি নিজে এসে ঘরদোর খুলে ওঁদের জিনিসপত্র খালাস করেছি। তার পর খালি ঘর ভালো করে পরীক্ষা করে, তবে তালা দিয়েছি। একটা কুটো কি তেলাপোকা নেই।

ও-বাড়িতে। তবু তোমাদের মনের শান্তির জন্যে ঘর খুলে দিচ্ছি।"

সদর দরজার চাবি খোলা হল। চার দিক শুন্-শান্, খাঁ-খাঁ করছে ঘর, একটা টিকটিকি পর্যন্ত পেলাম না। সুধাকান্ত দাদা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই। তোমরা ভুল শুনতে শুরু করেছ।"

চলেই যেতেন হয়তো, আমরা চেপে ধরলাম, "একবার রান্না-বাড়িটা দেখা যাক। ওর আলাদা তালা।" সুধাকান্ত দাদা বোধ করি একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "এ তো আচ্ছা গেরো! বলছি একেবারে শূন্য ঘর, তিন মাস খোলা হয় নি। মালি, খুলেই দেখা।"

ঝনাৎ করে তালা খুলল। এক মুহূর্ত সব চুপচাপ। ঘরের জানলা এঁটে বন্ধ, ভিতরটা ভালো দেখাও যাচ্ছিল না। তার পরেই হুঁ-য়্যা-য়্যা-ও! স্যাৎ করে একটা সাদা গোলা তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়া! আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। মন থেকে দশমণি বোঝা নেমে গেল।

সুধাকান্ত দাদা বললেন, "দেখলে! তেজ তো কম নয়! পাঁচ দিন জলস্পর্শ করে নি, তবু কাবু হবার নাম নেই! ভাবছি ঢুকল কি করে? এ-ঘর তো তিন মাস বন্ধ।"

সবাই মিলে পর্যবেক্ষণ করলাম। রান্না বাড়ির পাশেই বড় শিরীষ গাছ। তারই একটা ডাল রান্নাঘরের কাছাকাছি পৌঁচেছে। অভ্যাসমত খাবারের আশায় বেড়াল নিশ্চয় ঐ ডাল থেকে এক লাফে স্কাইলাইটে, আবার সেখান থেকে এক লাফে নীচে। কোথাও কিচ্ছু নেই! বেরোবারও পথ নেই! সম্বল শুধু ম্যাও ডাক! দিনেরবেলায় অন্যান্য শব্দের মধ্যে শোনা যায় না, রাতে কানে যায়। পুরুষেরা কেউ শুনতে পায় না। কারণ ঘুমোলে তারা কালা-বোবা হয়ে যায়। এ-ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের আরেক পাঠ।

মানুষ তৈরি

প্রায় সত্তর বছর আগে যখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ সাত আট বছর বয়সে প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলেন একটু ভয়ে ভয়েই গেলেন। কারণ তাঁর সমবয়সী আত্মীয়রা দিনরাত বলত, যাও না ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডায় মজা বুঝবে। যেমন সব বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলের দল, তেমনি তাদের দাড়িমুখো গুরু। পিটিয়ে তোকে তক্তা বানাবে দেখিস।

কিন্তু গিয়ে দেখলেন চার দিকে ধু-ধু করছে ঢেউ খেলানো খোলা মাঠ। এখানে ওখানে ভাঙা জমির লাল পাঁজরা বেরিয়ে আছে, বেঁটে খেজুর গাছ, মনসা ঝোপ, কেয়া-বন, তাল-বন। কোথাও কোথাও আম কাঁঠালের গাছ লাগানো হয়েছে। খড়ের ঘর, শুকনো হাওয়া, নীল দিগন্ত।

পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়। সামনে যেটি ছিল তারই নাম শান্তিনিকেতন। দোতলার ঘরে যে সুন্দর মানুষটির সামনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি যে কোনোদিনও কাউকে পিটিয়ে তক্তা বানাবেন না, সে বিষয়ে ছোট ছেলেটির মনে কোনো সন্দেহই রইল না।

ঐখানে গিয়ে দুরন্ত ছেলেরা দুদিনেই টের পেত যে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেও একটা কঠিন সংযমের ব্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে। গুরুদেব একবার অন্যায়কারীর দিকে তাকালেই সে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত। যেন বাজপাখির চোখ, সব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকে খুশি করার জন্য কি না করতে পারত ওরা।

দেখতে দেখতে কষ্ট-সহিষ্ণু আর কর্তব্য-পরায়ণ বলে ওদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। খুব ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। শিলঙ পাহাড়ের একটা জলপ্রপাতের হিম-শীতল ধারার পিছনে ধাপে ধাপে পা রেখে, একদল সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ছেলে দিব্যি উঠে গেল। ঘোরানো পথ দিয়ে আমরা উপরে উঠে শুনলাম ভিজে ঘাসে বসে গান গাইবার জন্য ওদের বকা হচ্ছে। তার পর সবাই বলতে লাগল, ওরা শান্তিনিকেতনের ছেলে, জলে-ঝড়ে রোদে-বৃষ্টিতে ওদের কিছু করতে

পারে না। ঐ আমার মনে ধারণা হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের ছেলেরা ভারি মজবুত জবরদস্ত।

আরো পরে কলকাতায় শান্তিনিকেতনের সমালোচকরা আবার উলটো কথা বলতেন। ওরা নাকি বেজায় ন্যাকা, ঝোলা পাঞ্জাবী পরে, লম্বা চুল রাখে, চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলা বলে। ওদের গুরু নাকি কোনো নাম করা পালোয়ানের মাস্‌ল কন্‌ট্রোলের খেলা দেখে বলেছিলেন, 'ওরে ও পাষণ্ডটাকে এখনি বিদায় করে দে!'

আরো শুনতাম ওখানে মারধোরের নিয়ম নেই বলে ছেলেগুলো মানুষ না হয়ে বাঁদর তৈরি হয়। তবে সেইসঙ্গেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের বিখ্যাত গল্পও বলা হত, কেমন করে তিনি এক বেয়াড়া ছেলেকে শায়েস্তা করেছিলেন। সে ছেলে ক্লাসের মাঝখানে একজোড়া জুতো এনে রাখল। ক্ষিতিমোহন নতুন এসেছেন, তাঁকে একটু অপদস্থ করার ইচ্ছা। ক্ষিতিমোহন বললেন, 'পরো।' সে বলল, 'না মশাই, এখানে খালি পা নিয়ম।'

'তা হলে সরাও।' 'না মশাই, সরাতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।' 'না সরালে চড় খাবে।' 'না মশাই, শান্তিনিকেতনের মাটিতে চড় মারার নিয়ম নেই!'

ক্ষিতিমোহন বললেন, 'বটে!' এই বলে তাকে কান ধরে শূন্যে তুলে ফেলে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলেন। 'এখন আর তুমি শান্তিনিকেতনের মাটিতে নেই, তাই এতে কোনো দোষ নেই।' আর কখনো তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয় নি।

আমি নিজে যখন ১৯৩১ সালে প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলাম, ছেলে-মেয়েদের নিয়ম-নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লম্বা-চুল, ঝোলা-পাঞ্জাবী ছেলে কলকাতায় অনেক দেখেছিলাম, ওখানে মাত্র একজনকে দেখলাম, কলাভবনের ছাত্র, কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা, ভদ্র-বলের পাণ্ডা।

দেখলাম পড়াশুনোর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় দৈনন্দিন কাজকে। চাকরবাকর কম। নিজেদের কাজ যতটা সম্ভব নিজেরা করে; ছোটদের কাজ অনেকখানি বড়রা পালা করে করে দেয়। ছাত্রের সংখ্যা অনেক কম, একটাই রান্নাঘর, সেখানেও ছেলেমেয়েরা পালা করে ডিউটি দেয়। পরিবেশন করে, বাসন ধোয়াতে হাত লাগায়। তা ছাড়া অতিথিদের দেখাশুনো করে; প্রতি বুধবার আশ্রম পরিষ্কার করে। এ-সব

কাজের জন্য ওদের পড়া থেকে ছুটি দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম মনে হত পড়ার ক্ষতি হচ্ছে না তো? পরে বুঝলাম পড়া মুখস্থটা বড় কথা নয়, আসল কথা মানুষ তৈরি।

বর্ষার দিনে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ত, চাঁদনি রাতে চড়িভাতি হত, বসন্ত-উৎসব, নাটক, নাচ-গান, সাহিত্য-সভা। নিজেরাই সব ব্যবস্থা করত ছেলেমেয়েরা। ফুল তুলত, মালা গাঁথত, আলপনা দিত, আসর সাজাত। প্রকৃতির সঙ্গে বারো মাসের সম্বন্ধ থাকত। ওদের গুরু বলতেন, নইলে সম্পূর্ণ মানুষ হবে কি করে, নিজের জায়গা বুঝবে কি করে? শুধু বই পড়ে কি গোটা মানুষ তৈরি হয়? 'তোতাকাহিনী'তেও এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

তবে দুষ্টু ছেলেরও অভাব ছিল না। কোথায়ই-বা আছে? তফাত এই যে মাস্টারমশাইরা তাদের সাজা দিতেন না। ছেলেদের বিচারসভা ছিল। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। রাতে সভা বসত। সাক্ষী-সাবুদ হাজির করে, দস্তুরমতো বিচার হত। আসামী দোষী সাব্যস্ত হলে, তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হত। কোনোমতেই পার পেত না।

নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা হত। গাছে ঠেস দিয়ে বসে যে যার প্রশ্নের উত্তর লিখত। পাহারাদার চোখে পড়ত না। বই খুলে কাউকে কখনো টুকতে দেখি নি। শুধু ছাত্র তৈরি হত না ওখানে, মানুষের চাষ হত।

অনেকে নিন্দা করতেন, বলতেন কলকাতার তুলনায় শিক্ষার মান বড় নিচু। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে ওখানকার স্নাতকদের মধ্যে সেকালে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানান ক্ষেত্রে দেশের সেবা করে স্বনামধন্য হয়ে আছেন।

ওস্তাদ

ছবির মতো পরিষ্কার মনে পড়ে জীবনের একেকটি ঘটনা। ১৯৩৯ সাল। শান্তিনিকেতনে প্রথম গেছি, ইংরেজি পড়াই স্কুলের উপরের ক্লাসে আর কলেজে। কিছু কিছু অঙ্কও কষাই। কিন্তু তাতে প্রতিদিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো রোজ চার কি পাঁচ ঘণ্টা কাটে। ঘণ্টা-খানেক কলাভবনে গিয়ে নন্দলাল বসুর কাছে একটু-আধটু ছবি আঁকা শিখি। রাতে হয়তো আট ঘণ্টা ঘুমোই।

এই তো গেল চোদ্দো ঘণ্টার হিসাব। আরো দু ঘণ্টা নিজের কাজে কাটালেও হাতে থাকত ইচ্ছে মতো উপভোগ করবার মতো পুরো আটটি সোনা বাঁধানো ঘণ্টা। স্রেফ দেখে দেখে, হেঁটে চলে, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রতিদিনকার এই বাড়তি আট ঘণ্টা কাটত। এখন বুঝতে পারি ঐ আটটি ঘণ্টাই ছিল সারাদিনের মধ্যে সব থেকে দামী।

ওস্তাদ বলে একজন বুড়ো লোক রোজ আমাদের হাজিরার খাতায় সই জোগাড় করে বেড়াত। মাস-কাবারে সেই আবার খুঁজে খুঁজে যার যার মাইনে দিয়ে যেত। আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম. এ. বলে অনেকের চেয়ে একটু বেশিই পেতাম। অর্থাৎ মাসে মাসে পুরো পঁয়ষট্টি টাকা। এতগুলো টাকা আমার হাতে ওভাবে দিতে ওস্তাদের ইচ্ছা করত না। বার বার বলত—কি করবে এত টাকা দিয়ে? রাখবে কোথায়? আমার সবটা খরচ করবার মতলব শুনে শক্ত হয়ে যেত। বলত, "ছি ছি, এইভাবে লোক খাইয়ে, চাঁদা দিয়ে, চটি কিনে, কাপড় কিনে এতগুলো টাকা ওড়াবে? টাকার দাম জান না? সেকালে এখানকার লোকরাই প্রাণ হাতে নিয়ে ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করত।"

আমরা বলতাম, "তাই-না আরো কিছু!"

ওস্তাদ রেগে যেত। বলত, "দেখতে পার ঝোপের গোড়ায় মাটির নীচে খুঁড়ে, কত মাথার খুলি বেরিয়ে পড়বে।" আমাদের বেজায় আগ্রহ হত। "কোথায়, ওস্তাদ, কোথায়?" "কেন, তোমাদের ঐ ছাতিম-

তলাও বাদ যাবে না।" শুনে আমরা শিউরে উঠতাম।

একদিন বলল, "প্রায়ই রাতে ওরা বর্ধমানে ডাকাতি করে, ভোরের বেলা ঘরে ফিরে শুয়ে থাকত। থানার লোকে খবর পেয়ে খানা-তল্লাসি করতে এসে দেখত, যে যার খোড়ো ঘরে মাদুর পেতে, ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে! ডাকাত ধরা পড়ত না।"

আমরা বলতাম, "হ্যাঁ, পাশের গাঁ কিনা! রাতারাতি বর্ধমানে গিয়ে ফিরে আসত, বললেই হল। কি করে যেত আসত? ট্রেনে করে?"

ওস্তাদ আকাশ থেকে পড়ত। "ট্রেনে করে আবার কি? কোথায় ট্রেন তখন! তার কত পরে ড্যালহৌসি সায়েব সুরুলের কুঠিবাড়িতে রাত কাটিয়ে, ফিরে গিয়ে ঠিক করল কোথা দিয়ে রেলের লাইন বসবে। ওরা রণ-পা চড়ে যেত। রণ-পা জানো তো? লম্বা-লম্বা বাঁশ। তাতে এক তলার ছাদের সমান উঁচুতে খাঁজ কেটে খোঁটা বাঁশ থাকত। তাতে পা বসিয়ে, বাঁশের ডগা বগলে চেপে ওরা বাতাসের বেগে যেত আসত।"

"থানার পেয়াদা রণ-পা দেখে কি বলত?"

"দেখবে তবে তো বলবে। ভোরের আগে বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে, দিঘির জলে রণ-পা ডুবিয়ে রাখা হত। উঠে পড়ে ওস্তাদ বলত, "যাই আমার কাজ আছে। যেয়ো একদিন আমাদের বাড়িতে।"

তাই গিয়েওছিলাম একদিন দল বেঁধে। বোলপুর রেল-স্টেশনের উত্তরে একটা পুল দেখা যায়। সেই পুল দিয়ে লাইন পার হয়ে ওপারে পারুল-ডাঙায় ওস্তাদের বাড়ি। অনেকটা পথ হাঁটতে হল, যখন গিয়ে পৌঁছলাম, সূর্য ডুবতে খুব দেরি নেই। ওস্তাদের কি রাগ! "এই তোমাদের লোকের বাড়ি যাবার সময় হল? আর ঘণ্টা দুই পরেই উপাসনার ঘণ্টা পড়বে না? বউ রাঁধবে কখন, তোমরা খাবে কখন?"

অনেক কষ্টে বোঝালাম আজ ফিরে যেতেই হবে। আরেকদিন এসে খেয়ে যাব। বাড়িসুদ্ধ সকলের কি দুঃখ। সোনার মতো ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটিতে ওরা আমাদের সরবতের মতো মিষ্টি জল, নিজেদের খেতের আখের গুড় আর বাগান থেকে সদ্য উপড়ানো গাছসুদ্ধ কাঁচা ছোলা এনে দিল। আর কখনো কেউ আমাকে নতুন আখের গুড় দিয়ে কাঁচা ছোলা খেতে দেয় নি। ওস্তাদের বাড়িতেও আর কখনো যাওয়া হয় নি।

খ্রীস্ট-উৎসব

আজকের এই সুন্দর দিনে যীশু জন্মেছিলেন। কোন মন্ত্রবলে মধ্য-এশিয়ার এক অখ্যাত গ্রামে, গরিব এক ইহুদী ছুতোরের ঘরে, এমন ছেলে জন্মাল যে, দু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সব চাইতে ধনী, সব চাইতে উন্নত দেশের, কোটি কোটি মানুষের মনের মর্মমূলে এমন করে নাড়া দিল যে, আজ পর্যন্ত তারা তাঁর নামে নিজেদের খ্রীশ্চান বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করে।

তার চাইতেও বড় বিস্ময় হল যে, কোনো নতুন ধর্মমত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না; তাঁর একমাত্র ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম, যার বলে মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারে; নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে; অপরকে ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে পারে। সুখী মানুষ আর কটা আছে? এ পৃথিবী দুঃখী দিয়েই ভরা। যীশু বারে বারে তাদের কথাই বলেছেন। তাঁর কথার মধ্যে ধর্ম-ভেদের প্রশ্নই ওঠে না, যেখানে যত বঞ্চিত, ব্যথিত, উৎপীড়িত আছে, তিনি তাদের কথা বলেছেন।

ম্যাথিউ লিখিত গস্পেলের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম অধ্যায়ে মানবজাতির সব ধর্মের মূল কথাগুলি লেখা আছে। সে-সব কোনো মহান আধ্যাত্মিক রহস্য নয়, যা শুধু পণ্ডিত ও সংসার-ত্যাগীর বোধগম্য হবে। সে-সব কথা সাধারণ, দুর্বল, মূর্খ, ভ্রান্ত, দুঃখীদের জন্য বলা হয়েছে; হতাশ যারা তাদের জন্য আশার কথা বলা হয়েছে; 'গস্পেল' শব্দের মর্মই তাই।

যীশুর শিষ্যরা বেশির ভাগই গরিব অশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। খেটে-খাওয়া শ্রমিক, জেলে। তাঁদের সকলকে যীশু বলছেন, "Ye are the salt of the earth, but if salt have last his savour, where with shall it be salted?"

তোমরা লবণের মতো, তোমরা না থাকলে সব-কিছু বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু লবণ যদি তার লবণাক্ত হারায়, তবে সে কার কোন কাজে

আসবে ? অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়ের গুণগুলিকে রক্ষা করো।

ভক্তদের আরো বলছেন, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.

"Neither do men light a candle and put it under a a bushel, but on a candle-stick and it giveth light unto all that are in the house.

"Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven."

তোমরা পৃথিবীতে আলো দেবে। পাহাড়ের চুড়োয় তৈরি যে নগর, তাকে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। মোমবাতি জ্বেলে কেউ ঘেরা-টোপ দিয়ে ঢেকেও রাখে না। মোমবাতি রাখতে হয় বাতি-দানে, যাতে সে-বাড়ির সকলে আলো পায়। তোমাদের আলোও লোকের সামনে জ্বলে উঠুক, সকলে তোমাদের সুন্দর কাজ দেখুক আর তাই দেখে তোমাদের যিনি পিতা সেই ভগবানের গুণগান করুক।"

এ-সব কোনো বিশেষ সৌভাগ্যবান সুখী লোকেদের কথা নয়, সাধারণ ঘরোয়া মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা ; কেমন করে তারা এই কঠিন পৃথিবীতে ক্লিষ্ট জীবন কাটাবে, সেই উদ্দেশ্যে বলা কটি স্নেহের আশ্বাস। বলছেন :

"...if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the alter and go thy way ; first be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift."

মানুষের মতো মানুষ হওয়াটা সব সময় খুব সহজ নয়, এমন-কি, শুধু পুজো করলেও যথেষ্ট হয় না। তাই যীশু বলেছেন : ভগবানের বেদীমূলে নৈবেদ্য নিয়ে এসে যদি মনে পড়ে ভাইকে তুমি ক্ষোভের কারণ দিয়েছ, তা হলে ঐখানে নৈবেদ্য ফেলে রেখে, আগে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটাও, তার পর পুজো দিয়ো।

গরিবদের মাঝখানেই বড় হয়েছেন, তাদের দোষ-দুর্বলতা কত দেখেছেন ; তাদের আচার-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় কত শিথিলতা ;

তাদের বলেছেন,

"Swear not at all...but let your communication be yea, yea, nay, nay."

মিছিমিছি দিব্যি গেল না, হাঁ বলতে হাঁ বল, না বলতে না বল, সেই যথেষ্ট।

লোক দেখানি ধর্মাচার যীশু সইতে পারতেন না। বলতেন: দান করবে যখন, কেউ যেন দেখতে না পায়। এমন-কি, ডান হাত কাকে কি দিল বাঁ হাত পর্যন্ত সে কথা জানতে না পারে। অর্থাৎ দানের গর্ব কোরো না।

যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, লোকের মাঝখানে করবে না, নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করবে, কারণ ভগবান তো গোপনেই থাকেন।

বার বার বলবে না—হে পিতা এই দাও, ঐ দাও। তিনি পিতা তিনি তো জানেন তোমাদের কিসের প্রয়োজন, তোমরা না চাইতেই তো তিনি সে কথা জানেন।

যখন উপবাস করবে, রুক্ষ চুলে ক্লিষ্ট মুখে কারো সামনে বেরুবে না। মাথায় তেল দেবে, মুখ ধোবে। লোক দেখাবার জন্য তো উপবাস নয়, পরম পিতাকে দেখাবার জন্য; তিনি গোপনে থেকেই সব দেখছেন।

যীশুর বলা কত কথা সমস্ত খৃস্টীয় জগতে প্রবাদের মতো হয়ে গেছে, সেগুলি এত সহজ, এত সত্য যে সকলের মনের মূলে আঘাত করে। অনেকে জানেও না যে কথাগুলি বাইবেল থেকে নেওয়া। যেমন—"Man does not live by bread alone," পেটের ক্ষুধা মিটলেই হল না গভীরতর ক্ষুধা আছে; সেগুলি মেটানো অত সহজ নয়।

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth, nor rust doth corrupt and no thieves break through and steal: for where your treasure is, there will your heart be also."

পৃথিবীর মাটিতে তোমাদের ধনসম্পদ রেখো না, সেখানে পোকায় কাটবে, মরচে ধরবে, চোরে নেবে। স্বর্গরাজ্যে ধন রেখো, সেখানে পোকাও নেই, মরচেও নেই, চোরও নেই। কারণ ধন যেখানে রাখ, মনও সেখানে থাকে।—ঘরোয়া মানুষকে বলা ঘরোয়া সব কথা।

"Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam in thine own?" ভাইয়ের চোখে ধুলোকণাটুকু পড়লে তোমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু সূর্যরশ্মিতে যে লক্ষ লক্ষ কণা নাচে, সে রশ্মি নিজেদের চোখে পড়লে কিছু বল না কেন?

সাধারণ মানুষের জীবন দিন-গুজরান করতেই কেটে যায়; তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের সময়ই-বা কোথায়, বুদ্ধিই-বা কতটুকু? যীশুর কথা সেই সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনকেই ঘিরে আছে। এ তো আর শুধু নিয়ম পালনের ধর্ম নয়, এ হল জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিনের বাঁচার ধর্ম। সংসার এর পীঠস্থান; সংসারকে ঘৃণা করলে চলবে কেন, সাধারণ মানুষরা তো সবাই সংসারী। ভক্তরা তাঁকে বলত ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিতেন মানবের পুত্র বলে। মানুষের দুর্বলতা তাঁর অজানা ছিল না। সাধারণ মানুষদের বলেছেন, "পবিত্র জিনিস কখনো কুকুরকে দিয়ো না, মুক্তো কখনো শুয়োরের সামনে ছড়িয়ো না।" আরো বলেছেন, "Whatsoever ye would that men should do unto you, do you even so to them." লোকের কাছে যেমন ব্যবহার চাও, তোমরাও তাদের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করো।

সংসার পীঠস্থান হলেও, শুধু সংসার সংসার করে জীবন কাটালে চলবে না। পাখিরা কই কালকের জন্য তো চিন্তা করে না, ফুলরা তো সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত হয় না। কালকের কথা নিয়ে ব্যাকুল হোয়ো না, আজকের কাজ আজ সারো, আজকের দুঃখ আজ মেটাও। "Sufficient unto the day is the evil there of."

যীশুর ধর্ম প্রেমের ধর্ম, ক্ষমার ধর্ম, তাই যে-কোনো মতাবলম্বীর হৃদয়ে তাঁর জন্য একটি কোমল উষ্ণ জায়গা থাকে। প্রেমের নিয়মই আলাদা, সে তো আর যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না, সবার জন্য কোল পেতে থাকে। যীশু বলছেন, "Ask and it shall be given unto

you. Seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you."

চাইলেই লাভ করবে, খুঁজলেই পাবে, করাঘাত করলেই দোর খুলে যাবে।

আজ সমস্ত খ্রীস্টীয় জগত আনন্দ-উৎসবে, বেশে-বাসে, উপহার-বিতরণে, দানে-উপাসনায় যীশুর জন্মদিন পালন করছে। কিন্তু আমাদের তো ও-সব নেই, আমরা কি-ভাবে আজ উৎসব করব? তাঁর প্রেমের বাণী, অভয় বাণী, কানে শুনব, চিত্তে ধারণ করব, তার চাইতে বেশি আমরা আর কিই-বা করতে পারি?

গান্ধীজির সবুজ পাতা

যদিও সম্ভবত ১৯১০ সালে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে নানারকম উৎপীড়নের চোটে টিকতে না পেরে, একদল ছাত্র নিয়ে দেশে ফিরে এসে, তাদের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিয়েছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তাদের সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ কি করে ছেলে মানুষ করতে হয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা তার ছাত্র-ছাত্রীরা সরল স্বাভাবিক সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠুক। কাজেই ওখানকার বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা খুবই সাদা-সিধে হলেও তারই মধ্যে ছেলেদের যাতে বেশি কষ্ট না হয়, গুরুদেবের সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি বলতেন, শরীরটা যদি একটু আরাম না পায়, পড়াশুনো কাজকর্মেও মন বসবে না। কেবলই মনে হয় কিসে একটু আরাম পাওয়া যায়, কিসে একটু কষ্ট কমে। ওদিকে গান্ধীজি চাইতেন কঠোর সংযমের মধ্যে ছেলেরা মানুষ হোক; কষ্ট সহ্য করুক, তাতে ভালো বৈ মন্দ হবে না।

আসলে দুজনের উদ্দেশ্যই আলাদা ছিল। কবি চাইতেন এদের মন ফুলের পাপড়ির মতো খুলে যাক, যার যা স্বাভাবিক গুণ তা ফুটে উঠুক, প্রকৃতির সঙ্গে ওরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে জানুক, এমন সুন্দর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এরা একে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখুক। স্বাধীনতা-

সংগ্রামীরা চাইতেন এরা সব স্বাভাবিক আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে, শুধু দেশের কাজেই ব্রতী হোক। এদের শুধু সেই দিকটাই ফুটুক যেটা দেশের কাজে লাগবে। আসলে কবিও সেই-ই চাইতেন তবে ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেও দেখতেন। তিনি চাইতেন এদের সমগ্র জীবনটাই দেশের কাজে লাগানো হোক। সম্পূর্ণ মানুষেরাই তো দেশের স্থায়ী সম্পদ। এদিকে বাইরের লোকে জানত শান্তিনিকেতনের কড়া শাসনে পড়ে দুষ্টু ছেলেরাও শায়েস্তা হয়ে যায়, তাই অনেক দুরন্ত ছেলেদের অভিভাবকরা, নিজেরা হার মেনে, গুরুদেবের ঘাড়ে তাঁদের ছেলে মানুষ করার ভার চাপিয়ে দিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেতেন। অথচ দুষ্টুগুলোকে মারধোর করা হত না, কোনো নিষ্ঠুর সাজা দেওয়া হত না, ভয় দেখানো হত না। তারা সত্যি অন্যরকম হয়ে যেত। তাদের মধ্যে অনেকেই পরে নিজেদের দেশের কৃতী সন্তান বলে নামও করেছিল। কি ছিল গুরুদেবের ছেলে বশ করার গোপন নিয়ম?

গোপন নিয়মটি আর কিছুই নয়, স্রেফ তিনি প্রকৃতির হাতে তাদের সঁপে দিতেন। তিনি দেখতেন প্রকৃতি নিজে বড় সুন্দর, বড় নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, বড় পরিচ্ছন্ন, বড় পবিত্র। তার চেয়ে ভালো গুরু আর কোথায় পাওয়া যাবে? পৃথিবীতে যত অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নিষ্ঠুরতা, নোংরামি, সবই তো মানুষের তৈরি এবং বেশির ভাগই শহুরে মানুষের তৈরি। গাছপালা, এমন-কি, জন্তু-জানোয়ারও তো নিজেদের দরকারের বেশি কিছু চায় না। দুর্বলের কাছ থেকে অনেক সময় কেড়ে নেবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু দলের মধ্যে থাকলে তাও করে না। আর মানুষের তো অনেক বেশি বুদ্ধি থাকে, তাদের তো আরো সর্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন কাটানো উচিত।

আশ্রমে সবাই নিরামিষ খেত, খালি পায়ে থাকত, ভোরে উঠত, শীতকালেও কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করত, নিজেদের সব কাজ নিজেরা করত। যারা খুব ছোট, বড়রা তাদের দেখাশোনা করত। সবাই অতি সাধারণ কাপড়-চোপড় পরত। কিন্তু উত্তম মানুষ হবার এইগুলোই আসল উপায় নয়। এ-সব নিয়মের অনেকখানিরই একমাত্র কারণ ছিল অর্থাভাব। অনেক কষ্টে গুরুদেবের বিদ্যালয় চলত। বাবার কাছ থেকে জায়গাটুকু আর কয়েকটা বাড়িঘর পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু চালাতে

হত নিজের খরচে। ছেলেদের কাছ থেকে যৎসামান্য টাকা নেওয়া হত। নিজের পুরীর বাড়ি বেচলেন, ওঁর স্ত্রী তাঁর গয়নাগুলিও বেচে দিলেন, চাঁদা তোলা হত, নাটক আর গানের আসর করা হত। এমনি করে খরচ চলত। তার পর কখন ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন সে টাকাগুলোও আশ্রমের পথঘাট তৈরি করতে ও অন্যান্য অভাব মেটাতে খরচ হয়েছিল। অনেক বছর পরে আশ্রমিকরা এই ঋণশোধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

অবিশ্যি কৃত্রিম বিলাসিতার স্থান ছিল না আশ্রমে। ফুলের মালা, ফলের পাপড়ি, কি বিচিত্র রঙে ছাপা কাপড়, এর চেয়ে বেশি সাজ আবার কোন মেয়ের দরকার ?

আমি যখন ১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে গেলাম, তখনো দেখলাম কি সাদাসিধা জীবনযাত্রা। পুরোনো কঠোর নিয়মে খানিকটা ঢিল দেওয়া হয়েছে, কারণ তখন আর অত অর্থকষ্ট নেই। কিন্তু তখনো সবাই সাদাসিধা কাপড়-চোপড় পরে; খালি পায়ে থাকে; নিজেদের কাজ নিজেরা করে; রান্নাঘরে, অতিথিশালায় পালা করে ডিউটি দেয়। স্বাবলম্বী না হলে কখনো মানুষ হওয়া যায় ? সামান্য কাজকেও শ্রদ্ধা করতে না জানলে, কেউ কখনো বড় কাজ করতে পারে ?

দেখলাম ফাল্গুন মাসে গান্ধীদিবস পালিত হল। সেদিন আশ্রমের সব ঠাকুর-চাকরদের ছুটি। তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে রান্নাঘরে খেয়ে যাবে। রাঁধাবাড়া, বাসনমাজা, ঘরধোয়া সব কাজ করল ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের মাস্টারমশাই আর দিদিমণিরা।

তখন ড্রেন পায়খানা ছিল শুধু শিশু বিভাগে আর সব জায়গায় খাটা পায়খানা। মেথরদেরও তো ছুটি, কাজেই কলা ভবনের ছেলেরা বালতি-ঝুড়ি-ঝাড়ু নিয়ে চলল পায়খানা পরিষ্কার করতে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম কোদাল কাঁধে সবার আগে চলেছেন ওদের মাস্টারমশাই দেবতুল্য নন্দলাল বসু। 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' গাইতে গাইতে ওরা কাজে লেগে গেল। ভাবলাম স্বয়ং গান্ধীজিই-বা এর চেয়ে বেশি কি চাইতে পারতেন ?

আয়নায় যেমন এক দিকে কালো না লাগালে অন্য দিকে আলো ফোটে না, জীবনের বেলাও তাই। এক দিকে এই সরল জীবনযাত্রা, অন্য দিকে নাচে, গানে, নাটকে, কাব্যে, ছবিতে, মূর্তিতে, গৃহ-সজ্জায়,

প্রকৃতিকে আর প্রকৃতির অন্তরে যে মহাপ্রাণ আছে তাকে আবাহন করা, গাছের মতো ডালপালা নেড়ে তাদের গুণগান করা।

বছরের ছয় ঋতুতে উৎসব করা হত। চাঁদনি রাতকে সম্বর্ধনা জানানো হত। নীল নবঘন বর্ষাকে আবাহন করা হত। ফসল লাগানো হল, বৃক্ষ-রোপণ উৎসব হল। ফসল কাটা হল, পৌষ উৎসব হল। প্রকৃতির প্রসাদ দুই হাত পেতে, বুক ভরে নেওয়া। তার বদলে মুক্ত হৃদয়ে উদার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জানানো। বুঝতে শেখা যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের মধ্যে ছোট আমাদেরও একটা নিজস্ব জায়গা আছে। সেখানে আমাদের দরকারি কাজ করতে হয়, হাত পেতে প্রসাদ নিতে হয়।

এই সবাই মিলে কাজ করাটি দেখতে বড় ভালো লাগত। লক্ষ্য করতাম আপনা থেকেই কেমন একটা স্বার্থ-ত্যাগ আর সকলের সঙ্গে সহানুভূতির ভাব এসে যাচ্ছে। অথচ রুক্ষতার মধ্যে দিয়ে নয়, আনন্দের মধ্য দিয়ে।

নিয়মের যে ব্যতিক্রম হত না তা বলছি না। দুর্বল মানুষের দুর্বলতা থাকবে সে আর আশ্চর্য কি? অপরাধীকে ধরে পেটানো হত না, হেড-মাস্টারের ঘরেও ডেকে নিয়ে যাওয়া হত না। তার চেয়েও ভয়াবহ এক ব্যবস্থা ছিল। সেটি হল বিচার-সভা। রাতে বসত বিচার-সভা; বিচার করত ছেলেরা নিজেরা। মাঝে মাঝে খুব কঠিন দণ্ড দিত। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ছিল ঐখানে গিয়ে দাঁড়ানোর লজ্জা, বন্ধুদের নীরব ধিক্কারের আশঙ্কা! বিচার-সভাকে মানে না, এমন একটি ছেলের কথাও মনে পড়ছে না আমার।

আসল কথা হল মানুষ হতে হলে মানবজীবনকে শ্রদ্ধা করা চাই, পৃথিবীকে ভালোবাসা চাই। এই দুইটি অমূল্য রত্নই গুরুদেব দিতে চেয়েছিলেন তাঁর ভাগ্যবান শিষ্যদের। শ্রদ্ধা করার আগে চিনতে পারা চাই, ভালোবাসার আগে কাছে আসা চাই, পাশে বসা চাই।

অবনীন্দ্রনাথের একশো বছর

একেকজন লোক থাকে, তারা অল্পসময়ের মধ্যে ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করে উঠে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু যতই থাকে কাটতে দিন, তাদের প্রতিভা যেন কেমন চোখ-সওয়া হয়ে যায়, পরে কাউকে ততটা অভিভূত করতে পারে না। আবার একেকজন থাকে যাদের দেখে প্রথমটা সকলে ততটা মুগ্ধ হয় না, কিন্তু যতই দিন কাটে, হীরের টুকরোয় নানান দিক থেকে আলো পড়লে যেমন নানান কোনা থেকে অপ্রত্যাশিত সব রঙের ছটা চোখ ঝলসে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ হলেন সেই শেষের দলের।

রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, তাঁর চেয়ে বছর দশেকের ছোট, তাঁর পরম ভক্ত ও বন্ধু, একই জায়গায় মানুষ অথচ অনেক বেশি লাজুক, অনেক বেশি আড়ালে থাকা স্বভাব। কাকার অসাধারণ প্রতিভার পাশে অবনীন্দ্রনাথের গভীর স্নিগ্ধ স্বরূপ, কেউ তত লক্ষ্য করত না। অবিশ্যি কেউ না করলেও 'রবিকার' নজর এড়িয়ে যায় নি। দশ বছরের ছোট ভক্তটি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকত, ফাই-ফরমায়েস খাটত, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ঝাণ্ডা তোলা, পতাকা তৈরি করা, গানের দলে ভিড় বাড়ানো, ইত্যাদি কাজেও ভারি পটু ছিল। তা ছাড়া দুজনেই স্কুল পালানো ছেলে, মনের মিল তো গোড়া থেকেই ছিল। যদিও কাকার নতুন দেওয়া গানের সুর ভাইপো মাঝে মাঝে স্রেফ ভুলে যেত! আবার নতুন সুর দিতে হত।

এত সব সত্ত্বেও কি করে যে অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে বা লেখাতে কোথাও রবীন্দ্রনাথের এতটুকু অনুকরণ নেই, তাই দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। আসল ব্যাপার হল যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই অবনীন্দ্রনাথের স্বাধীন প্রতিভা, নিজের এমন একটা জোরালো রূপ নিতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ ভালোবাসতেন না।

অবনীন্দ্রনাথের যখন কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, আঁকিয়ে বলে তাঁকে অনেকে জানত, কিন্তু তাঁর লেখা-টেখার দিকে মন ছিল না। সেই সময়

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি ভবনের এক তলায় ছোট ছেলেদের জন্য ছোট্ট একটা স্কুল খুললেন। এখন ছাত্র যদি-বা মিলল মাস্টারমশাই না হলে স্কুল কি করে চলে? বিশেষ করে বিনি পয়সার মাস্টারই-বা কোথায় পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথ তখন অন্য দু-একজনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকেও মাস্টার পাকড়ালেন। এই কাকাটিকে না বলা শক্ত। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন মাঝে মাঝে তাঁর আব্দারের ফলে, তাঁদের নানান প্রতিযোগিতার খেলায় রবিকাকে সভাপতি হতে, পুরস্কার বিতরণ করতে হয়েছিল। কাজেই অবনীন্দ্রনাথ মাস্টার বনে গেলেন।

ছোট ছেলেগুলোকে তিনি এমন সুন্দর গল্প বলতেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধরে বসলেন ছোটদের জন্য ঠিক যেমন করে গল্প বলেন, তেমনি ভাবে গল্প লিখতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়লেন! লিখতে তিনি পারেন নাকি? কাকাও ছাড়বার পাত্র নন, কেন লিখতে পারবেন না? ভাষায় কোনো খুঁত থাকলে তিনি নিজে দেখে দেবেন। তখন অনেক ভয়ে ভয়ে শকুন্তলা লেখা হল। কি কোমল, কি মিষ্টি, কি সুন্দর সে গল্প! শুনলে পর মনের মধ্যে ছবির মতো ফুটে ওঠে।

সে বই পড়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রবিকার কাছে সাহস পেয়ে অবনীন্দ্রনাথের মনে হল তাঁর অন্তরের যেন একটা দরজা খুলে গেল, তিনি যেন আলো-বাতাসে বেরিয়ে এলেন। পর পর অনেকগুলো অপূর্ব বই লিখে ফেললেন। কোন কালে সে-সব বই প্রথম ছাপা হয়েছিল, আজও তারা পুরোনো, সেকেলে হওয়া দূরে থাকুক, যতই পড়া যায়, ততই যেন নতুন নতুন গুণ চোখে পড়ে। এ ধরনের লেখাকে বলে কালোত্তর। এগুলোর আদর কখনো ফুরোয় না।

১৮৯৫ সালে 'শকুন্তলা' ছাপা হল। ১৮৯৬ সালে 'ক্ষীরের পুতুল'। ১৯০৯ সালে 'রাজকাহিনী', ১৯১৫তে 'ভূতপত্রীর দেশ', ১৯১৬তে 'নালক'। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'পথে-বিপথে' বড়দের জন্য লেখা, ১৯২১এ ছাপা 'খাজাঞ্চির খাতা' ছেলে-বুড়ো সবাই পড়ুক। মাঝখানে অনেকদিনের একটা ফাঁক। তার মধ্যে বই লেখাও হয়েছিল, ছবিও আঁকা হয়েছিল, কিন্তু ছেপে বেরুনোর হিসাব পাচ্ছি না। ১৯৪১ সালে 'বুড়ো-আংলা' বই হয়ে বেরুল, আগেই অবিশ্যি মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি বই আছে, লেখার অনেক পরে সেগুলি বই হয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকরূপে রচয়িতা নিজে দেখে যান নি। এখানে 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'আপন কথা' আলোর 'ফুলকি', 'মাসি', 'একে-তিন-তিনে-এক', 'মারুতির পুঁথি', 'রং-বেরং', 'চাঁই বুড়োর পুঁথি' এবং সবার শেষে 'কিশোর সঞ্চয়ন'।" এগুলির মধ্যে কোনটাকে ছোটদের বই বলব, কোনটাকে বড়দের বই বলব ভেবে পাচ্ছি না। সবাই সব পড়ুক, যে যেটুকু পারে বুঝে নিক এমন আশ্চর্য জিনিস বাংলা ভাষায় আর নেই।

এ ছাড়া জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বইও আছে, যেমন 'ভারত-শিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'প্রিয়দর্শিকা', 'চিত্রাক্ষর', 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী', 'সহজ চিত্র-শিক্ষা', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ', 'ভারত-শিল্পে মূর্তি', 'শিল্পায়ন' ইত্যাদি বোঝাই যাবে এগুলি শিল্পের বিষয়ে বই। এত ভালো শিল্পের বই কম দেখা যায়। বাগেশ্বরী প্রবন্ধগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পের মূল কথা, মর্মের গোড়ার কথা, এমন অপূর্বভাবে কেউ কখনো বলতে পেরেছে কি না জানি না।

অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতেন, মনে হত ছবিগুলো বুঝি দর্শকের কানে কানে কথা কইছে। আবার যখন গল্প লিখতেন, মনে হত চোখের সামনে মাদুরের মতো গুটনো একটা অফুরন্ত ছবি, পাকে পাকে খুলে যাচ্ছে। কোথায় তার শুরু হয়েছিল, কোথায় তার শেষ হবে কেউ ভেবে পাবে না। সেগুলি জীবনের মতোই কোমল, মধুর, হাসি-কান্নায় মেশানো, কেবলই স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে।

পড়তে পড়তে গলার মধ্যে ব্যথা করে, বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করে। খালি মনে হয়, এ তো আমাদেরই মনের কথা, আমাদেরই হতাশার সুরে কাতর আমাদেরই আহ্লাদে রঙিন।

অনেকে তাঁকে খামখেয়ালী বলে, তাঁর লেখাকে উদ্ভট বলে। খেয়ালী ছিলেন বৈকি আর বুঝতে না পারলে উদ্ভট তো মনে হবেই। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, কেমন করে ছবি আঁকতে হয়? না, তুলিটাকে জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে, তবে ছবি আঁকতে হয়। আর লেখার কথায় বলেছেন যেখানে যা কিছু আশ্চর্য, অপূর্ব, অদ্ভুত, যা কিছু সুন্দর, সব মনের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়, যাতে সৃষ্টিকাজের জন্য যখনই দরকার হবে, তখনই

খাঁটি জিনিস পাওয়া যাবে। কি লেখায়, কি আঁকায়, মিথ্যার কোনো জায়গা নেই।

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে এ-সব কথা একবার মনে করা যাক।

বিবিদি

বিবিদি মানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা আর স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁকে প্রথম যখন দেখি তখনো আমি বেশির ভাগ সময়ই ফ্রক্ পরি। হয়তো এগারো বারো বছর বয়স হবে। অবিশ্যি আমি সে-সময়ে বা অন্য কোনো সময়ে কখনো তাঁকে বিবিদি বলে ডাকি নি। আমার এক প্রাণের বন্ধু বুবুর তিনি হতেন জ্যাঠাইমা, আরেক প্রাণের বন্ধু অলকার হতেন কাকি। তারা তাঁকে ন' মা বলত কারণ হরিপুরের চৌধুরী বাড়ির তিনি ছিলেন ন' বউ। তাদের দেখাদেখি আমিও বলতাম ন' মা। তা ছাড়া তখনো তিনি সর্বজনীন বিবিদি হন নি, খুব বেশি লোক তাঁর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেত না।

সেই প্রথম দেখার দিনটি ছিল বোধ হয় ১৯২০ সালে। সেদিন আমার বন্ধুর জন্মদিন, ওদের মে-ফেয়ারের বাড়িতে চা-পার্টি। মেলা লোকজন এসেছিলেন। তারই মধ্যে শ্বেতপাথরের চওড়া বারান্দায়, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চেয়ে মাথায় লম্বা, ফরসা, সুন্দর একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। পরণে গাঢ় রঙের রেশমী শাড়ি, বাঘের নখের পিন দিয়ে আঁটা, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, সামান্য গয়না পরা। তবু তার মধ্যে দেখলাম ছোট একটি সোনার বো-বাঁধা ব্রুচ্ থেকে ক্ষুদে একটা সোনার ঘড়ি ঝুলছে। আর দেখলাম গোলাপী পদ্মফুলের মতো সুন্দর একজোড়া পা। দেখে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নে। শুনলাম লেখাপড়ায় গানবাজনায় তিনি অদ্বিতীয়া বয়স হয়তো পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

তার পরেই কিন্তু একটা ছোট অর্গ্যানের সামনে বসে, সোজা আমার

দিদির আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন গানটা গাইবে?' আমাদের তো চক্ষুস্থির। লজ্জায় মরে গেলাম। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। গানের ইস্কুলে পাঁচজনের সঙ্গে চ্যাচানো গলা আমাদের লোকসমাজে প্রকাশিতব্য নয়। ভাগ্যিস আর সকলে গান ধরল, বুবু, অলকা, ন' মার দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই রূপসী কন্যা জয়া আর মঞ্জু। এরা সবাই ন' মার হাতে তৈরি; এ ধরনের জিনিসই তিনি ভালো-বাসতেন—গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, চিত্রকর্ম, লেখাপড়া। তাঁর কাছে গুণের বড় আদর ছিল। কারো মধ্যে এতটুকু প্রতিভা দেখলে আহ্লাদে আটখানা হতেন, পাঁচজনের কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। দিদি আমি স্কুলে ফরাসী শিখেছি শুনে কি খুশি। কার কি ভালো আছে, প্রথম দেখা থেকেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করার চেষ্টা করতেন।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন মানিক-জোড়; ছেলেমেয়ে ছিল না ওঁদের। চার দিকে একটা নৈর্ব্যক্তিক বাৎসল্যের আলো ছড়িয়ে রাখতেন। কত লোকে এসে ওঁদের কাছে জড়ো হত তার ঠিক নেই; কেউ লিখত, কেউ আঁকত, কেউ গাইত, কেউ বাজাত আর কেউ-বা শুধু বসে বসে কথা শুনত। ওঁদের বাড়িতে পূর্ণিমা সম্মেলনী হত, স্রেফ চাঁদের হাট। শহর জুড়ে জ্ঞানীগুণী জড়ো করতেন। ঐখানে একদিন বেশ কমবয়সী সুদর্শন নরেন্দ্র দেবকে দেখেছিলাম মনে আছে। সত্যেন্দ্রনাথকেও দেখেছিলাম। ন' মা তাঁকে রুপোর গ্লাসে করে ডালিমের রস এনে খাওয়ালেন।

এ-সব ঘটনার পর সুখে দুঃখে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, প্রায় পঞ্চাশটি বছর। ন' মাকে এর মধ্যে নানান অবস্থায় দেখার সুবিধা হয়েছিল। সুখ-ঐশ্বর্যের মাঝখানে যত-না ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, পার্থিব দুর্দিনে পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বামী-স্ত্রী কেউই খুব সাধারণ ছিলেন না। আত্মীয় বন্ধুরা ওঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা সমীহ করলেও, ওঁদের অসাক্ষাতে একটু না হেসেও পারতেন না। বিয়ের পর নাকি সারারাত দুজনে Bach Beethoven নিয়ে তর্ক করে কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে উত্তেজনার চোটে গলা যখন একটু উঁচুতে চড়ত, কৌতূহলী আত্মীয়রা এত উষ্মার কারণ Bach Beethoven শুনে বিস্মিত হতেন। সাধারণ সাংসারিক বিষয়ে তাঁদের কখনো বিচলিত হতে দেখি নি।

মর্মর প্রাসাদ

কলকাতার চোরবাগানে মল্লিকদের মর্মর প্রাসাদের প্রচুর খ্যাতি আছে। তাকে কলকাতার সব চেয়ে পুরোনো বাড়ির মধ্যে ধরা হয়। শোনা যায় ১৮৩৫ সালে তৈরি, অর্থাৎ সেণ্ট পলের গির্জা, জি.পি.ও. বা হাইকোর্টেরও আগে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বংশধররা ট্রাস্টি সহকারে আজ পাঁচ পুরুষ ধরে এ বাড়ির তত্ত্বাবধান করছেন। কারিগর বাদল পালের বংশও পাঁচ পুরুষ ধরে ওখানকার শিল্পকর্মের ভার নিয়ে আছেন। এঁরা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিলেন।

অসাধারণ একটা বাড়ি। সেকালের ফ্যাশান-মতো বাইরেটা গ্রীক ও কোরিন্থীয় নিয়মে তৈরি। সামনে বড়-বড় খাঁজ-কাটা থাম। বাগানে নানান শ্বেতপাথরের মূর্তি। ভিতরে আশ্চর্য এক সংগ্রহ-শালা। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে দেশী জিনিস বিশেষ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু বহুমূল্য ইউরোপীয় শিল্পকর্ম কিম্বা তার অনুকরণ চার দিকে থরে থরে সাজানো।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পীদের অপূর্ব সব ছবি আছে। ওঁরা বলেন যে তার মধ্যে মাত্র চারটি ছবি শিল্পীদের নিজের হাতের কাজ, বাকি সব নকল। কিন্তু এত অপূর্ব নকল যে নকল না আসল তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞদেরও ধাঁধা লেগে যায়। ঐ চারটি আসল ছবি হল রুবেন্সের আঁকা 'সেন্ট ক্যাথারিনের বিবাহ' আর 'সেন্ট সেব্যাস্টিয়েনের প্রাণ-দান' এবং রেণল্ডসের 'হারকিউলিস ও সাপ' আর 'ভিনাস ও কিউপিড'।

নিঃসন্দেহে বলা যায় অতি মূল্যবান সংগ্রহ। শোনা যায় যে মুরিলোর ছবির নকলগুলোরই একেকটার দাম হবে পনেরো হাজার পাউণ্ডের বেশি। কয়েকটি ফুলদানি আছে, তারও একেকটার দাম দশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে।

একেবারে যে কোনো ভারতীয় ছবি নেই, তাও নয়। সেকালের

বিখ্যাত শশী হেষের ও রবি বর্মার কিছু ছবি আছে। এঁরা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকতেন। শশী হেষ-তেল রঙ বা ক্রেয়ন দিয়ে আশ্চর্য সব প্রতিকৃতি আঁকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইতালীয়। শোনা যায় স্বামী যেমন অপূর্ব ছবি আঁকতেন, তিনি তেমনি অপূর্ব রাঁধতেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জন্ম ১৮১৯ সালে। জাতে ওঁরা সুবর্ণ বণিক, আদিবাস উত্তরপ্রদেশের রামগড়ে। ওঁর ঠাকুরদা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর জমিজমা পয়সাকড়ি করেছিলেন। রাজেন্দ্রের যখন যোলো বছর বয়স তখন তাঁর ঠাকুরদা এই বাড়ি তৈরি করেন। ওঁর বাবা অকালে মারা যান। স্যার জেম্‌স্‌ ওয়ার হগের হাতে সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়েছিল। সাবালক হয়েই রাজেন্দ্র নিজের হাতে সে ভার নিলেন।

ভারি বিদ্বান ছিলেন তিনি। চারুশিল্প, সংগীত, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণী-তত্ত্ব, সব-কিছুর চর্চা করেছিলেন। দুর্লভ সব জানোয়ার ও পাখির সংগ্রহ ছিল। আজ পর্যন্ত মার্বল প্যালেসের পশু ও পাখির সংগ্রহ দেখতে হাজার হাজার লোক যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে দেশ-বিদেশের প্রাণী ও শিল্পসামগ্রী তাঁর বাড়িতে দেখা যায়, কিন্তু নিজে কখনো বিদেশে যান নি। বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করতেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক এই সংগ্রহশালাটি জনগণের আনন্দের জন্য রেখে গেছেন। এ-সব দেখতে পয়সা লাগে না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া যে-কোনো দিন, বেলা দশটা থেকে চারটের মধ্যে গিয়ে দেখে আসা যায়।

এ ধরনের উদার ধনী লোক শুধু আজকাল কেন, সেকালেও ছিল বলে শোনা যায় না। দেদার সম্পত্তি ছিল তাঁর। যে জমির উপরে চৌরঙ্গী অঞ্চলের স্যাটার্ডে ক্লাব, ফার্পোর রেস্তোরাঁ, টাওয়ার হাউস, তা ছাড়া নতুন বাজার তৈরি, সে-সবই মল্লিকদের ঠাকুর জগন্নাথজির দেবোত্তর সম্পত্তি। ভারি তীক্ষ্ণ বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল রাজা রাজেন্দ্রের। উইল করে তিনি তাঁর সম্পত্তির বেশির ভাগটাই জগন্নাথের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন। মর্মর প্রাসাদের বাগানেই ঠাকুরের মন্দির। সেখানে বিজলি-বাতি জ্বলে না। সারি সারি স্ফটিকের ঝাড়-লণ্ঠনে শত শত মোমবাতি জ্বলে। এ-সব সম্পত্তির মালিক জগন্নাথ। কিছুদিন আগেও সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মহাঘটা করে ঠাকুরের কাছে দাখিল

করা হত।

মন্দির থেকে জগন্নাথজিকে এনে প্রাসাদের মধ্যে একটা খাঁটি সোনার সিংহাসনে বসানো হত। মল্লিকরা, অছিরা, অন্যান্য কর্মীরা সকলে তাঁকে প্রণাম জানাবার পর, একে একে সব কটা হিসাব খাতা ঠাকুরের সামনে তুলে ধরা হত।

এখনো রথের দিনে মল্লিক বাড়ির জগন্নাথজিকে মন্দির থেকে বাইরে এনে, রুপোর রথে বসিয়ে বাগানের মধ্যে টেনে বেড়ানো হয়। খুব জাঁকজমক হয়, মেলা বসে, যাত্রার পালা হয়, ভিড়ে চার দিক গম্‌গম্‌ করে।

প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো এই মর্মর প্রাসাদ কলকাতার একটা গৌরবের বস্তু। রাজা রাজেন্দ্রের আদেশে ট্রাস্টের আয় থেকে শুধু যে বহুমূল্য শিল্প-সামগ্রী বা দুর্লভ পশু-পাখি কেনা হয় তা নয়। আয়ের বেশির ভাগই খরচ হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, যেমন শিল্প-বস্তুগুলোও কেনা হয় জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য।

বহু অনাথা বিধবা ও নিঃস্ব লোক মাসোহারা পান। রোজ দুপুরে ঠাকুরের ভোগের পর, এক হাজার গরিব লোক খেতে পায়। দুর্ভিক্ষের সময়, বিপদের সময় আর উদ্বাস্তুদের জন্য বহু অর্থ দান করা হয়।

একশো বছরের বেশি এই নিয়ম চলে আসছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কেউ যদি ঐশ্বর্যকে যথার্থ সম্মান দিয়ে থাকেন, তিনি হলেন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক।

ভুতনি

আমি রোজ সকালে চান করে, ভুতনিকে কোলে নিয়ে আমাদের সামনের বারান্দায় বসে থাকতাম। কি ভালো জায়গাটা। বসে বসে দেখতাম আমগাছের ডালে এক জোড়া হুপো পাখি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। তাদের পিঠে মাছের কাঁটার মতো ডোরা কাটা। ছাদের ওপর দিয়ে ছাই রঙের হাঁড়িচাঁচা উড়ে যেত, তাদের ল্যাজের মধ্যিখানের দুটো পালক কি লম্বা! কি সুন্দর দেখতে আর কি বিশ্রী

করে ডাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি দেখতাম।

একদিন ছাদ থেকে বুগানভিলিয়া গাছের ডাল বেয়ে এই মোটা একটা মস্ত কালো সাপ নেমে এল। তাকে দেখে সব চড়াইরা, শালিখরা গুড়গুড়িরা মাটিতে নেমে ডানা ঝাপটাতে আর বিকট কিচির্-মিচির্ করতে লাগল।

আর একটা মস্ত গিরগিটি থপ্ করে ছাদের ওপর থেকে আমার পাশে পড়ে, কাঠ হয়ে রইল। ওর গা থেকে রামধনু রঙ ঠিকরোতে লাগল আর বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। আমি দেখতে পেলাম।

ভুতনিও ভয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজে রইল। ভুতনি আমার কালো রঙের বেড়াল-ছানা। ওকে আমি খুব ভালোবাসি। মাঝে মাঝে খিদে পেলে বেচারি মাছ-টাছ খেয়ে ফেলে। তখন সবাই বলে, 'ওকে দত্ত সাহেবের বাড়িতে দিয়ে এসো, সেখানে বড়ো ইঁদুরের উৎপাত।' আমি তখন খুব কাঁদি। ভুতনি নাম ভালো না? রাঙামামা নাম রেখেছে।

দুদিনের জন্য সিউড়ি গেলাম, ফিরে এসে দেখি বুগানভিলিয়া গাছের ডালে, ছোট্ট একটা সোনার সুতোয় বোনা টাকার থলির মতো কি একটা ঝুলে রয়েছে। ছোট্‌না বলল, "কাছে যেয়ো না দিদি, তা হলে বাসা ফেলে উড়ে চলে যাবে। আর আসবে না।"

"ও কে, ছোট্‌না?"

"ওর নাম মৌটুসি। মধু খেয়ে থাকে। ডিম দেবে বলে কেমন বাসা বানাচ্ছে দেখেছ? বেশি হাত-পা নাড়লে ও ভয় পাবে। চুপটি করে বসে দেখো।"

"বাসা বুনবার সোনার সুতো ও কোথায় পেল?"

"সোনার সুতো কোথায়, দিদি? ও তো শনের দড়ির, পাটের দড়ির পাক খুলে নিয়েছে। ভুট্টার দাড়ি জড়িয়েছে আর তোমাদের ফেলে দেওয়া রঙিন সুতো আর মাছের আঁশ দিয়ে সাজিয়েছে।"

চেয়ে দেখি ঠিক তাই।

এমন সময় মুখে একটুখানি শিমুল তুলো নিয়ে পাখি এল। ছোট্ট, আমার কড়ে আঙুলের চেয়েও ছোট। যত বড় গা, তত বড় ঠোঁট। ঐ ঠোঁট ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বোধ হয় মধু খায়। গায়ের রঙটা সবুজ না হলদে বুঝতে পারলাম না। সুড়ুৎ করে বাসায় ঢুকে গেল।

মাসি এসে উল-কাঁটা নিয়ে আমার পাশে বসল। আমি ঠোঁটে

আঙুল দিয়ে বললাম, "চুপ। মৌটুসি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।"

মাসি চুপ করে বুনতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় টিক্ টিক্ শব্দ হতে লাগল। মৌটুসি বাসার মুখ থেকে মার্বেলের মতো ছোট্ট মাথা বের করেই আবার ঢুকিয়ে নিল। বললাম, "মাসি, তুমি যাও। ও ভয় পাচ্ছে।"

মাসি চলে গেল। মৌটুসিও অমনি বেরিয়ে এসে বুগানভিলিয়ার ডালে বসে পালক সাফ করতে লাগল। আমি বললাম, "ভুতনি, ঐ দ্যাখ। তোর মতোই নরম মিষ্টি, আওয়াজ করিস নে। ভয় পেলে পালিয়ে যাবে।"

ভুতনি আমার কোল থেকে নেমে, ল্যাজ খাড়া, পিঠ বাঁকা করে, নখ বের করে, ফ্যাঁস্ শব্দ করে, এক লাফ দিল। মৌটুসি সেই যে উড়ে গেল, আর এল না।

ভুতনিকে দত্ত সাহেবের বাড়িতে দিয়ে এসেছি। দেখছ না আমার চোখে জল?

স্বেন হেদিন

ছোটদের জন্য খুদে খুদে সত্যি গল্পই সব চেয়ে ভালো। শোনো বলি—

স্বেন হেদিন ছিলেন উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের সুইডেন দেশের পর্যটক। কিন্তু তাঁর ভ্রমণের জায়গা ছিল মধ্য এশিয়া, মধ্য ইউরোপ, তিব্বত, পামীর, হিমালয়। সরকারি সাহায্য ও বিস্তর লোকজন, জন্তু-জানোয়ার, যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র নিয়ে তিনি ভ্রমণ করতেন। তাঁর কাজ ছিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা, মানচিত্র তৈরির জন্য মাপ-জোক করা, স্থানীয় অবস্থার নির্ভুল বিবরণী লেখা। কাজেই বুঝতেই পারছ তাঁকে কত তোড়-জোড় করে তবে বেরুতে হত। সুদূর সুইডেন থেকেও সে-সব জাহাজে বা কোনো গাড়ি করে পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মেলা অসুবিধা। কাজেই ঐখানে গন্তব্য স্থানের যতটা কাছাকাছি সম্ভব তিনি গিয়ে ডেরা

বাঁধতেন। বলা বাহুল্য সেখানকার রাজসরকার ও অধিবাসীরা তাঁকে কম সাহায্য করত না। মাঝে মাঝে বিপদেও পড়তে হত। আবার মজার মজার ঘটনাও ঘটত।

একবার বোগদাদে আস্তানা গেড়েছেন। জিনিসপত্র, উট, খচ্চর, ঘোড়া, খাবার-দাবার, অনুমতি-পত্র, মাল-বাহক, পথ-প্রদর্শক সব জোগাড় হচ্ছে। এতটুকু নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। তার উপর সাধু ফকির দরবেশের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে হচ্ছিল। একদিন সন্ধেবেলায়, সারাদিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেয়েছেন, এমন সময় এক নাছোড়বান্দা দরবেশের পাল্লায় পড়লেন। সে লোকটা কিছুতেই নড়ে না, তাকে কিছু দিতেই হবে। স্বেন হেদিন বিরক্ত হয়ে তাকে একটা তামার পয়সা দিলেন। তাই দেখে সে চটে লাল। "কি, আমার মতো একজন শক্তিধর দরবেশকে মাত্র একটা পয়সা দেওয়ার মানেটা কি?"

স্বেন হেদিন নিজে ও দেশের ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। দরবেশের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হচ্ছিল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আগে তোমার শক্তির কিছু পরিচয় দাও, তার পর দেখা যাবে।"

লোকটা বলল, "বেশ, আমি পৃথিবীর সব ভাষায় কথা বলতে পারি। বলুন কোন ভাষা শুনতে চান।" হেদিনের ভারি মজা লাগল। তিনি বললেন, "তা হলে কিছু ভালো সুইডিশ কথা শোনাও তো দেখি।"

বলবামাত্র লোকটা মাথা তুলে বিশুদ্ধ সুইডিশ ভাষায়, অপূর্ব উচ্চারণে বিখ্যাত সুইডিশ প্রাচীন সাহিত্য থেকে গড়-গড় করে বলে যেতে লাগল। স্বেন হেদিনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। তখন সেই লোকটা থেমে, একটু হেসে, বোগদাদী ভাষায় বলল, "নাঃ, আপনাকে আর এভাবে বিস্ময়ে আড়ষ্ট করে রাখাটা উচিত নয়।"

এই বলে একটানে তার চুল দাড়ি খুলে ফেলল। স্বেন হেদিন দেখলেন তার নীচে থেকে বেরিয়ে পড়ল সুইডেনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় উপসালার স্বনাম-ধন্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এবং তাঁরই বন্ধু।

আরেকটা গল্প শোনো। তোমরা নিশ্চয় জানো যে রবীন্দ্রনাথ নানান দেশে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ভ্রমণ করতেন। এতে ভারত সম্বন্ধে অনেক দূর দেশের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে গেছিল। তাঁর মতো

এত ভালো দূত আর কোথায় পাওয়া যাবে। তখন তো আর কোথাও দূত পাঠাবার জো ছিল না, কারণ তখনো এখানে বৃটিশ শাসন চলছিল।

সে যাই হোক, একবার কবি জাপানে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৺আর্যনায়কম। তাঁরই কাছে এ গল্প শুনেছি। জাপানে রবীন্দ্রনাথের সম্মানের অবধি ছিল না। তাঁকে দেখবার জন্য লোক ভেঙে পড়ল। বহু সভা, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন হল। তিনি নিজেও পরে এ-সব বিষয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতেন। এইরকম একটা ভোজ-সভায় তিনিই ছিলেন সম্মানিত অতিথি। তাঁর পাশে আর্যনায়কম আর যতদূর মনে হয় শ্রদ্ধেয় ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ও ছিলেন।

একের পর এক জাপানের শ্রেষ্ঠ পদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, পণ্ডিত ও গুণিজন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কবি মুগ্ধনয়নে ও কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ভাবে সমবেত জনতাকে, সুদৃশ্য সভাগৃহকে ও বাইরের অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

তার পর যখন তাঁর বক্তৃতার পালা এল, তিনি সকলকে অভিভূত করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁর সেই মধুর গম্ভীর কণ্ঠে ইংরিজিতে যা বলতে আরম্ভ করলেন, তার সারমর্ম হল যে—মুখের ভাষার চেয়েও মর্মগ্রাহী একটা ভাষা আছে, সে হল হৃদয়ের ভাষা। সে-ভাষা বুঝতে হলে যে কথার মানে জানবার দরকার করে না, এ-সত্য আজ তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন। এতগুলি বন্ধুর এত মধুর অভিবাদনের এক বর্ণও মানে না বুঝতে পারলেও, তাঁদের বক্তব্য গিয়ে একেবারে তাঁর হৃদয়ে পৌঁচেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর বক্তৃতার শেষে তুমুল অভিনন্দনের মধ্যে কবি বসে পড়েই, আর্যনায়কমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তুমি তখন আমার জামার হাতা ধরে বার বার টানছিলে কেন ?"

আর্যনায়কম বললেন, "টানছিলাম, কারণ ওঁরা প্রত্যেকে বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"

সরোজিনী নাইডু

১৮৭৯ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হাইদ্রাবাদে সরোজিনী নাইডু জন্মেছিলেন। আমরা ছোটবেলা থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছিলাম। সকলে বলত অসাধারণ নারী, ভারতীয় নারীত্বের প্রতিমূর্তি। অনেকে আক্ষেপ করে এ-ও বলতেন, ওঁর একমাত্র খুঁত হল বাঙালীর মেয়ে হয়েও বাংলা জানেন না।

অনেকদিন আগের কথা বলছি, তখনো রাজনীতির ক্ষেত্রে সরোজিনী ততটা প্রতিষ্ঠা পান নি, বরং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর সম্মান ছিল খুব বেশি। কলকাতায় একবার সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কমলা বক্তৃতামালাও হতে পারে, ঠিক মনে নেই। অমনি ছাত্র মহলে, সাড়া পড়ে গেল। এমন অসাধারণ বক্তৃতা কেউ কখনো শোনে নি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলেন। চেহারা ও বাচনভঙ্গি আলাদা হলেও, কার বক্তৃতা যে বেশি মধুর সে কথা বলা শক্ত, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না।

পরতেন খদ্দর, দেশী গয়নাগাঁটি। দেখতে ভালো ছিলেন না; মোটা, মাথায় বেশি লম্বা নন, রঙ শামলা, মুখ-চোখের গড়নও ভালো নয়। কিন্তু যেই-না ঠোঁট দুটি ফাঁক করে দুটি কথা বললেন, অমনি শ্রোতারা সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। যেমনি ভাব, তেমনি ভাষা। অমন মধুর ইংরিজি আর কোনো ভারতীয় মেয়ে বলেছে বলে মনে হয় না। মনে হত যেন রবি-রশ্মি লেগে হীরে থেকে আলো ছিটোচ্ছে।

অনেক পরে, তাঁর মৃত্যুর, এক-আধ বছর আগে, শান্তিনিকেতনে তাঁকে হয়তো সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে ভাষণ দিতে শুনেছিলাম। তেমনি মধুর, তেমনি মর্মস্পর্শী, তেমনি উজ্জ্বল, কিন্তু বড় ক্লান্ত। আসলে কিন্তু ঐটে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল না। যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক ভাষণের জ্বালাময়ী বাণী শুনেছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রকৃত শক্তির আরেকটু পরিচয় পেয়েছিলেন। কথাকে তিনি মর্মান্তিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন, শত্রুকে লজ্জা দিতে, দুঃখী দেশবাসীকে

আশা দিতে, অলসকে জাগিয়ে তুলতে। ঐ অগ্নিময়ী ভাষার গুণে, গান্ধীজি যখন কারারুদ্ধ হতেন, সরোজিনী নাইডু দেশবাসীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে রাখতেন, এতটুকু নিরুৎসাহ হতে দিতেন না।

এও হয়তো তাঁর কাব্য-প্রতিভারই আরেকটি রূপ। ওঁদের পরিবারের অনেকেই কাব্যগুণকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ওঁর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী হলেও, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। মা নিজে কাব্য রচনা করতেন। সরোজিনীর কনিষ্ঠ ভাই শ্রীহারীন্দ্রনাথও সুকবি।

সরোজিনী জন্মেছিলেন হাইদ্রাবাদে, পিতার কর্মস্থলে। ওঁরা ওখানকারই অধিবাসী হয়ে গেছিলেন, বাংলায় খুব যাওয়া-আসা ছিল না। তারই ফলে সরোজিনীরা বাংলা শেখেন নি। ইংরিজিই ওঁদের মাতৃভাষার মতো ছিল। তা ছাড়া আর কোনো ইংরেজিয়ানা ছিল না সরোজিনীর। এবং ঐ ইংরিজি ভাষাকেও তিনি ভারতের গুণগানের ও দেশপ্রেমের জয়গানের কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

চেষ্টা করে কবি হবার দরকার হয় নি তাঁর। নিজেই বলেছেন যে এগারো বছর বয়সে অঙ্ক কষতে বসে, হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেললেন। ঐখান থেকেই তাঁর কবি জীবনের শুরু হল। বারো বছর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন প্রবেশিকা পাশ করলেন, তার আগেই দীর্ঘ এক কবিতা আর একটি নাটক এবং অনেক ছোট কবিতা লিখে ফেলেছেন।

মেয়ের প্রতিভা দেখে হাইদ্রাবাদ সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠালেন। সেখানে তিনি বছর তিনেক ছিলেন। লণ্ডনে কিংস কলেজে, কেম্ব্রিজে গার্টনে পড়েছিলেন। দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। সকলে বলেছিল অতিরিক্ত খেটে ছিলেন বলেই অমন হয়েছিল।

ঐ তিন বছর বাস্তবিকই বৃথা কাটে নি। প্রতিভাময়ী কবি বলে ও-দেশে তাঁর প্রচুর খ্যাতি হয়েছিল। ভারতের বুলবুল পাখি বলে তাঁর নাম হয়েছিল। নামটি শুনেই বোঝা যায় ঐ সময়ে তিনি কি ধরনের কবিতা লিখতেন। নিজের দেশের বিষয়ে, মধুর ছন্দে মিষ্টি কবিতা। তাতে তাঁর কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয়

পাওয়া যায় না। তবু এই ভারতীয় মেয়েটির যে প্রবল একটি ব্যক্তিত্ব আছে, সে কথাও দেশের মনীষীরা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয় নারীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

দেশে ফিরে তাঁর বিবাহ হল, অ-বাঙালী এবং অ-ব্রাহ্মণ ডাক্তার গোবিন্দ রাজালু নাইডুর সঙ্গে। এতেই প্রমাণ হল গতানুগতিকের পথে চলবার মেয়ে তিনি ছিলেন না। দুই মেয়ে, দুই ছেলে হয়েছিল তাঁদের। তাদের নিয়ে কত সুখী হয়েছিলেন সরোজিনী, সে কথা তাঁর দুটি-একটি কবিতা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনে আবদ্ধ থাকবার জন্য তিনি জন্মান নি।

দেশে ফিরেই দেশের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর যেন চোখ ফুটে গেল। ঐ সময়ে হাইদ্রাবাদে নিদারুণ বন্যা হয়েছিল। সরোজিনী ত্রাণ-কার্যে যোগ দিয়েছিলেন। মনের মধ্যে দেশপ্রেমের কুঁড়ি এবার ফুটে উঠল। দুঃখী দেশবাসীদের সেবায় তিনি যোগ দিলেন। সেখান থেকে গান্ধীজির দেশসেবার ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করাই স্বাভাবিক। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৯ সালে জীবনের অবসান পর্যন্ত, সরোজিনী গান্ধীজির নির্দিষ্ট পথে চলেছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এর পর স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যতই তিনি জড়িত হয়ে পড়ছিলেন, ততই তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর হচ্ছিল। সব কবিদের হৃদয়ে যে একটি দুর্ধর্ষ নির্ভীক বিপ্লবীর আদর্শ থাকে, যে নানান ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে, সরোজিনীর হৃদয়ের মধ্যে থেকে সেই তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল। তিনি কাউকে ভয় করতেন না। যেখানেই দেখতেন দেশবাসীদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, দেশমাতার অপমান হয়েছে, সেখানেই জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। ব্রিটিশ রাজপুরুষ তার কণ্ঠরোধ করতে পারে নি।

শুধু কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামের আবর্তের মধ্যে সর্বদা তাঁকে দেখা যেত। তিনি অহিংসার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। দেশে ও বিলেতে আলোচনার টেবিলে তাঁকে যেমন দেখা যেত, লবণ-আন্দোলনের সময় মিছিলের মধ্যেও তেমনি তাঁকে দেখা যেত। আশ্চর্য প্রাণশক্তি ছিল তাঁর। স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়, দেহ খুব পটু নয়, তবু সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল তাঁর স্থান। নিশ্চিন্ত ভাবে কারাবরণ

করতেন।

ক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মীর আসন থেকে নেত্রীর স্থান নিতে হয়েছিল তাঁকে। তার পর যখন ১৯৪৭ সালে দেশ-ভঙ্গ ও স্বাধীনতা একসঙ্গে এল, তাঁকে করা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল। তার দুই বছর পরে ৭০ বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হয়।

সরোজিনী নাইডুর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করার সময়, অনেকে বলে থাকেন যে তাঁর জীবনটিকে দুটি আলাদা পর্যায়ে ভাগ করা যায়, এক হল তাঁর সাহিত্যকর্মের জীবন, আর হল তাঁর রাজনীতির জীবন। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক-না কেন, আসলে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ছিল, এইমাত্র। প্রকৃত কবি যাঁরা, তাঁদের দেহ যতই ক্ষীণ হোক-না কেন, তাঁদের মধ্যে এক ধরনের প্রচণ্ডতা দেখা যায়। তাঁরা যাকে অন্যায় বলে মনে করেন, তার বিরুদ্ধে তাঁরা সিংহের বিক্রমে প্রতিবাদ করে থাকেন। তাঁরা যাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন, তার জন্য তাঁরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন।

সরোজিনীর সব কাজের মধ্যে এই প্রবলতার পরিচয় পাওয়া যেত। প্রথম বয়সে যে-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিদেশী মনীষীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই প্রতিভাই উন্মোচিত হয়ে উত্তরকালে প্রবল ও প্রচণ্ড দেশ-প্রেমের রূপ নিয়েছিল। সে দেশপ্রেমে কোনো বিলাসিতা, আলস্য, কৃত্রিমতা ছিল না। সরোজিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজির পথ নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর বাগ্মিতাই তাঁর প্রবল অস্ত্র। সেই বাগ্মিতার সঙ্গে মিলে ছিল তাঁর প্রচণ্ড সাহস ও প্রবল ব্যক্তিত্ব, যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্দমনীয়। এক দিকে যেমন ছিল তার কবিদের প্রসাদগুণ, অপর দিকে ছিল তাঁর ঐ কবিদেরই প্রবলতা। সেই শক্তির জোরেই যখনই গান্ধীজিকে কারারুদ্ধ করে তাঁর মুখ বন্ধ করা হত, তখনি শোনা যেত সরোজিনী নাইডুর উদাত্ত কণ্ঠ। গান্ধীজি ছিলেন তাঁর গুরু; গুরুর আরব্ধ কাজ করে যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য ও কর্তব্য। ভারতীয় নারীত্বের এমন মহিমময়ী চিত্তগ্রাহী রূপ সহজে দেখা যায় না। তাঁর জন্মের পর ৯৪ বছর কেটে গেছে, কিন্তু সে রূপ এতটুকু ম্লান হয় নি। কবিরা রাজনীতির পথে নামলেও, তাঁরা হলেন চিরন্তন পথের পদযাত্রী।

একগুপ্টি

উত্তর কলকাতায় অ্যামহার্স্ট রো বলে একটি সরু রাস্তা আছে, বছর চল্লিশ আগে ঐখানে একজন দাড়িওয়ালা গুরুগম্ভীর লোককে দেখা যেত। দিব্যি দশাসই চেহারা, গলাখানিও তেমনি। 'ক্যা-রে!' বলে যেমনি একটা হাঁক দিতেন অমনি যে যেখানে থাকত একেবারে পাথর বনে যেত।

লোকটির বাড়ি ছিল বাঙাল দেশে, ওঁদের গাঁয়ের মধ্যে সেকালে বাঘ-টাঘ ঘুরে বেড়াত। সেখানকার লালচে রঙের আলু আর মিষ্টি আনারসের ভারি খ্যাতি ছিল। আর বাড়ির মেয়েরা ক্ষীর নিয়ে ছাঁচে ফেলে যে নাড়ু তৈরি করত, সে যে একবার খেয়েছে তার আর ভুলবার জো থাকত না।

লোকটির নাম ছিল সারদারঞ্জন রায়, যেমনি তাঁর শরীরের শক্তি, তেমনি বুদ্ধি আর মনের তেজ। যেমনি ভালো সংস্কৃত আর অঙ্কশাস্ত্র জানতেন, তেমনি খেলতেন ক্রিকেট। এমন-কি, লোকে তাঁকে বলত এদেশের ক্রিকেটের বাবা।

তখনকার দিনের খেলার মাঠের অবস্থা কি আর এখনকার মতো ছিল? ফুটবলের ছিল ভারি আদর, কিন্তু ক্রিকেটের মাঠে টিম্‌টিম্ করত কয়েকটি দর্শক। ঐ দাড়িওয়ালা লোকটির চেষ্টাতেই অনেক লোকে ক্রিকেট খেলার কদর শিখল।

মাছ ধরতেও ভারি ওস্তাদ ছিলেন; এদিকে অত বড় পণ্ডিত লোক, একটা কলেজের অধ্যক্ষ, ওদিকে ছুটি পেলেই ছিপ কাঁধে ছোট ভাইদের ডেকে নিয়ে, এখানে ওখানে মাছ ধরতে চলে যেতেন। চৌরঙ্গীর ধারে তাঁর মস্ত দোকান ছিল, সেখানে খেলার সরঞ্জাম আর নানারকম মাছ ধরবার ছিপ পাওয়া যেত। সেও যে-সে ছিপ নয়, তার বাঁশ আসত বর্মা থেকে। প্রত্যেকটি আলাদা করে বাছাই করা, এতটুকু খুঁত বেরুলে সে বাঁশটা ফেলে দেওয়া হত।

এক বাড়ি বোঝাই আত্মীয়-স্বজনের ছেলেপুলে মানুষ করতেন সারদারঞ্জন, যেমনি ছিল তাদের যত্ন, তেমনি তাদের কড়া শাসন। গান

বাজনা ইয়ার্কি রকবাজি কোনোরকমে চলত না। একবার একজন বয়স্ক ভগিনীপতি ছেলেদের সব নিয়ে গেলেন কোথায় যেন ফিল্ম-টিল্ম দেখানো হবে। তার মধ্যে একটাতে ছিল তাঁরই সুগন্ধি কোম্পানীর মজাদার বিজ্ঞাপন। এখন সেটি দেখতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল। ভগিনীপতি ঘোড়ার গাড়ি করে মোড়ের মাথায় ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তারা বাড়ি গিয়ে দেখে ফটক বন্ধ, কাউকে নাকি ভেতরে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই।

কি আর করা যায়। গেল সবাই ভগিনীপতির আশ্রয়ে। পরদিন সকালে তিনি গিয়ে অনেক অনুনয় করে বললেন যে, তাঁরই জন্য দেরি হয়েছিল, ছেলেদের মাপ করা হোক। সারদারঞ্জন গম্ভীরভাবে বললেন, 'হেমজাটার মা নেই, ওটা থাকুক। আর সব কটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও, চরে খাক।'

অবিশ্যি তা আর হয় নি, হেমজার সঙ্গে সব সুড়্‌সুড়্‌ করে গিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল।

ঐ ভগিনীপতিটির নাম হেমেন্দ্রমোহন বসু, যার তৈরি কুন্তলীন, দেলখোস বিলেতী সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে পাল্লা দিত। তাঁর ছেলে নীতীন বসু ও মুকুল বসু ফিল্ম তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছেন।

সারদারঞ্জন রায়ের মেজো ভাইয়ের নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর আপন নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়, এক কালে নামটি বদলান। তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকা বের করতেন। ছোটদের জন্য অমন মাসিক-পত্র আজ অবধি আর হল না এ দেশে। গুষ্টিসুদ্ধ সবাই মিলে, বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে এনে, ঐ কাগজে এমন সব গল্প, কবিতা, ধাঁধা, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন, এমন সব রঙিন ও সাদা কালো ছবি আঁকতেন, যে পুরোনো 'সন্দেশ' যদি খুঁজে পাও তো তোমাদের তাক লেগে যাবে। তার ওপর যেমনি কাগজ, তেমনি ছাপা।

উপেন্দ্রকিশোরের ছড়ায় লেখা 'ছোট্ট রামায়ণ' পড়লে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে, তা ছাড়া 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্পে'র তো কথাই নেই।

তেল-রঙ দিয়ে চমৎকার ছবি আঁকতেন উপেন্দ্রকিশোর, আর সাদা কালো দিয়ে গল্পগুলোকে চিত্রিত করতেন।

ছাপাখানার জগতেও তিনি স্বনামধন্য। হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং-এ ছবি

ছাপা এদেশে তিনিই প্রথম করেছিলেন। বিলেতেও সেজন্য খুব খাতির পেয়েছিলেন। এ-সবের ওপর গান লিখতেন, চমৎকার বেহালা বাজাতেন।

তাঁর বড় ছেলের নাম সুকুমার রায়। কি আর বলব সুকুমার রায়ের কথা। ছোটবেলা থেকে চারি দিকে একটা আনন্দের ঢেউ তুলে, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। বড়-বড় চোখ, এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল, ইস্কুলে যখন পড়েন তখন থেকেই রসের উৎস। একজন মুসলমান বন্ধু জানতে চাইলে, কি করে ভাই চুলগুলো এমন কোঁকড়া করলে। তখুনি বললেন শুয়োরের তেল মেখে। সেও তোবা তোবা করে সরে পড়ল। কারো বিষয় হয়তো গল্প করলেন যে মাস্টারমশাইকে বইয়ের একটা সাদা পাতা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'এইটেই পড়ে এসেছি স্যার, অন্ধকারে দেখতে পাই নি।' ছোট ভাই সুবিনয় দারুণ স্বদেশী, তার নামে ছড়া বাঁধলেন—

"আমরা দিশি পাগলার দল,
দেশের জন্যে ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল।" ইত্যাদি।

কবিতাটাতে দিশি জিনিসের কথা আরো আছে—

"দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি,
তা হোক-না, তাতে দেশেরই মঙ্গল।"

তখনকার দিনে ভালো-দিশি জিনিস পাওয়া যেত না, সুবিনয়কে কেউ কিছু কিনতে দিলে, সে দিশি ছাড়া কিনত না, যেমন পেত তাই নিয়ে আসত। এই নিয়ে বাড়িময় একটা হাসির রোল উঠত। এখন চমৎকার দিশি জিনিস তৈরি হয়, সুবিনয় এবার শোধ তুললেন।

সুকুমার রায়ের লেখা বই তোমাদের ঘরে ঘরে আছে, তার বিষয় কিছু বলবার নেই, 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল' 'খাই-খাই', 'বহুরূপী', 'পাগলা দাশু', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি কে না পড়েছে।

সুবিনয়ও গুণী লোক ছিলেন, ফরসা, লম্বা সুন্দর মানুষটি, ভারি মিষ্টি লেখা বেরুত তাঁর কলম থেকে। তাঁর 'আজব-বই', 'খেয়াল', 'বল তো', পেলেই পড়বে। তোমাদের এমন বন্ধু কম আছে।

এঁদের এক বোনের নাম সুখলতা রাও। এখনো আছেন তিনি, সাহিত্যসেবা করে যাচ্ছেন; সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে। অদ্ভুত মিষ্টি সব কবিতা কলমের আগা থেকে এখনো অজস্র ধারায় ঝরছে। তাঁর সব পরীদের গল্প, জানোয়ারদের গল্প আছে, 'গল্প আর গল্প' 'গল্পের

বই' এমনি ধারা কত কি। যখন যা লিখেছেন তাই ভালো হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের সেজো ভাইয়ের নাম ছিল মুক্তিদারঞ্জন রায়, কয়েক বছর হল বিরাশির ওপর বয়সে তিনি মারা গেছেন। অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, মুখে বেশি কথা ছিল না, কিন্তু খেলাধুলোয় আর শারীরিক শক্তিতে সেকালের দুর্ধর্ষ মিলিটারী টিমগুলোকে পর্যন্ত অবাক করে দিতেন! তাঁরা জানতেন যে ঐ ষণ্ডামার্কা দাড়িওয়ালা ছেলেটা বড় সহজ পাত্র নয়, ওকে পেড়ে ফেলে এমন সাধ্য ছিল না কারো। তাঁর ছোট ভাই কুলদারঞ্জন রায়কে যেন ভুলে যেয়ো না। ইংরেজি ও প্রাচীন গ্রীস রোমের গল্প থেকে অনুবাদ করে তোমাদের কত উপহার দিয়েছেন তিনি। 'ওডিসিয়ুস', 'ইলিয়াড', 'রবিন হুড', 'শার্লক হোমসে'র গল্প ইত্যাদি। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীরও তোমাদের জন্য কত নতুন সংস্করণ করে দিয়েছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আরো কত। সব চাইতে ছোট ছিলেন প্রমদারঞ্জন রায়। চাকরির কর্তব্যে বর্মা ও ভারতের বনে বনে ঘুরতে হয়েছিল, তার আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা লিখেছেন তাঁর 'বনের খবর' নামের বইতে! পড়ে দেখো। এঁরা দুজনেই নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন।

এই গুষ্টির আরেক ছেলে সত্যজিৎ রায়কে তোমরা নিশ্চয় চেনো! যেমন ভালো ছবি আঁকেন, তেমনি ভালো ফিল্ম তৈরি করেন। দেশে তাঁর নাম হয়েছে, তাতে ভারতেরও কত সম্মান হয়েছে। সুকুমারের ছেলে তিনি।

দেশপ্রেমিক কাকে বলে? যারা দল বেঁধে পথে বেরিয়ে চ্যাঁচামেচি করে, এটা ওটা ভেঙে নস্যাৎ করে দেয়, তাদের? না যাঁরা দেশের জন্য এমন সব কাজ করে যান, যা থেকে তাঁরা মারা যাবার পরও বহুকাল ধরে, দেশের লোকে উপকার পায়, আনন্দ পায়, সম্মান পায় তাঁদের?

পৌরুষই-বা কাকে বলে? অনেকে ভাবে বুঝি কবিতা লিখলে, গল্প লিখলে, ছবি আঁকলে, বেহালা বাজালে, ছেলেরা সব মেয়েলী হয়ে যায়। বুঝি শরীরটাকে শক্ত করতে হলে, মনটাকে খানিকটা দাবিয়ে রাখা দরকার। বুঝি এগিয়ে যেতে হলে, আমাদের দেশের পুরোনোটাকে পেছনে ত্যাগ করে আসতে হয়। বুঝি খেলাধুলো করলে পড়াশুনা হয় না। এ-সব কথাই যে কত ভুল, এই একটি গুষ্টির খেলোয়াড়, গাইয়ে, বাজিয়ে, গল্প লিখিয়ে, ছবি আঁকিয়েরাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

সুখলতা

সে আসলে ময়মনসিংহের মেয়ে, তার চোদ্দো পুরুষের বাস ছিল সেখানে, ব্রহ্মপুত্রের ধারে, মসূয়া নামের একটা গ্রামে। মাথায় অনেকের চাইতে একটু লম্বা, চুলগুলো একটু বেশি ঢেউ খেলানো, মুখখানি একটু বেশি গম্ভীর, গলার আওয়াজ বড় মিষ্টি। থাকে কলকাতায়, পড়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় বলে একটা স্কুলে। বাপের নাম উপেন্দ্রকিশোর, ভারি আশ্চর্য মানুষ তিনি। ফরসা রঙ, টিকোল নাক, দেখতে ভারি সুপুরুষ। ছবি আঁকেন, বেহালা বাজান, ছোটদের জন্য বই লেখেন, রামায়ণের গল্প মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই, মহাকাশের কথা, সেকালের কথা। ছোটদের জন্য মাসিক-পত্রিকা নিজের ছাপাখানায় ছেপে বের করেন। নাম তার 'সন্দেশ'; যেমনি তার ছবি, তেমনি তার কবিতা, গল্প।

আশি বছর আগের কথা। সুখলতা তাঁর বড় মেয়ে। তুলি ধরলেই তার ছবি বেরোয়, কলম তুললেই গান হয়ে যায়, গল্প হয়ে যায়। কলকাতায় থাকলেও ছুটি-ছাটাতে সবাই মিলে দেশে যায়। সেখানকার আম কাঁঠাল বাগান, বড়-বড় পুকুর বড়ই ভালো লাগে। তার উপর বাড়িতে দুই হাতি ছিল। একটার নাম যাত্রামঙ্গল, যেমনি বড় তেমনি মেজাজ। নোংরা কাপড় পরা কাউকে দেখলেই তাড়া করত। একবার পরিষ্কার কাপড় পরে এক বুড়ি সামনে সামনে যাচ্ছিল তাকেও করল তাড়া। বুড়ি তো একবার তাকিয়েই পড়িমরি করে দে ছুট। হাতিও অমনি দৌড়তে লাগল। শেষটায় মাথার ওপরকার চালের পুঁটলি ফেলে বাঁশবনে ঢুকে বাঁচল। যাত্রামঙ্গল ময়লা কাপড় বাঁধা পুটলিটাকে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে, আবার ভালো মানুষের মতো চলল।

অন্য হাতির নাম ছিল কুসুমকলি। নধর দেহ, মিষ্টি স্বভাব, পায়ে শুঁড় বুলিয়ে প্রণাম করত। এদের ছেড়ে যেতে কার ইচ্ছা করে?

ছুটির শেষে মনে দুঃখ নিয়ে সবাই ফিরে আসত। কোথায় এমন

'নানা নিবন্ধ

নীল আকাশের নীচে, সবুজ গাছপালায় পাতা দিয়ে নৌকো করে বেড়ানো যায় ?

সুখলতা বড় ভালো মেয়ে ছিল। ছোট-ছোট ভাইবোন ছিল। তাদের মধ্যে সবার বড় সুকুমার, সে যে কি মজা করত বলা যায় না। মজার ছবি আঁকত, ছড়া কাটত, নাটক লিখত, অভিনয় করত, ভেংচি কাটত। তার পর পুণ্যলতা, তার লেখা মিষ্টি বই আছে, ছেলেবেলার দিনগুলি। তার ছোট সুবিনয়, সে-ও লিখত, গান গাইত। তার পর সুবিমল, উদ্ভট গল্প বানাতে ওস্তাদ। সবার ছোট শান্তিলতা ভারি চমৎকার কবিতা লিখত। মা বিধুমুখীর আদর-যত্নে সবগুলি মানুষ হল। এখন আর কেউ নেই, পুণ্যলতা আর সুবিমল ছাড়া। তাদেরও পঁচাত্তর ছাড়িয়েছে।

সুখলতার বিয়ে হয়েছিল ওড়িষ্যার বিখ্যাত মধুসূদন রাওয়ের ছেলে ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে। যেমনি ভালো আঁকতেন, লিখতেন, তেমনি সুন্দর ঘরকন্নাও করতেন। কত সুন্দর করে নিজের হাতে বাড়িঘর সাজাতেন, নতুন নতুন রান্না শিখে, সবাইকে খাওয়াতেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ; লোভ ছিল না, হিংসা ছিল না, মুখ দিয়ে কখনো মিথ্যা কথা বেরুত না, কারো অনিষ্ট করতেন না। তবে ছোটবেলায় একটু আরশুলো ইঁদুরকে ভয় পেতেন। সুকুমার যেই-না বলত, 'ডুলির নীচে লালচে মতো ওটা কি রে ?' অমনি পিঁড়ি থেকে উঠে চম্পট! চোর, মাতাল, গোরু-ঘোড়া দেখে ঘাবড়াতেন, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এতটুকু ঘাবড়াতেন না।

সুখলতার দাদামশাইয়ের নাম ছিল দ্বারিক গাঙ্গুলী, বেজায় তেজী সমাজ সংস্কারক ছিলেন তিনি। তাঁর যৌবনকালে একবার কোনো খবরের কাগজের সম্পাদক মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে বিশ্রীভাবে বিদ্রূপ করে-ছিলেন। দ্বারিক গাঙ্গুলী সেই লেখাটি কাঁচি দিয়ে কেটে পকেটে ভরে, হাতে একটা লাঠি নিয়ে, ঐ সম্পাদকের কাছে গিয়ে, কাগজটাকে গুলি পাকিয়ে জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করেছিলেন। ইংরিজিতে বলে "ইট ইয়োর ওয়ার্ডস," অর্থাৎ "নিজের কথা খাও।" তার মানে নিজে যা বলেছ, তা প্রত্যাহার কর। তাই করতেও হয়েছিল ঐ সম্পাদককে। এই দ্বারিক গাঙ্গুলীর মেয়ের মেয়ে তেজী হবে না তো কি হবে ?

দুই পুরুষ ধরে বাঙালী ছেলেমেয়েরা সুখলতা রাওয়ের হাতে লেখা

মিষ্টি মিষ্টি গল্প, কবিতা পড়ে মানুষ হয়েছে। দেশ-বিদেশের রূপকথা উপকথা সংগ্রহ করে সহজ বাংলায় তিনি লিখে দিয়েছেন। 'গল্পের বই' 'আরো গল্প' 'গল্প আর গল্প' আরো কত কি। আর সে যে কি মিষ্টি সব ছড়া। তার কিছু কিছু সুর দিয়ে কলকাতার বেতার থেকে বাজানো হয়েছে। তেল-রঙে জল-রঙে যে-সব ছবি আঁকতেন পাহাড় গাছপালা, আর অপূর্ব সব সমুদ্রের দৃশ্য। পুরীর সমুদ্র দেখে মনটা তাঁর অন্যরকম হয়ে গেছিল। ছোটদের জন্য বই লিখেছেন, 'নিজে পড়' 'নিজে শেখ' ইত্যাদি। আশি বছর যখন বয়স, তখনো মুখে এক কথা, কি লিখব, কি ভাবে লিখব। বছর দুই হল, তিনি চোখ বুজেছেন; কিন্তু বইগুলি ছবিগুলি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সব বাঙালী ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার।

পুণ্যলতা

গত ২১শে নভেম্বর বালিগঞ্জের তিনকোনা পার্কের দক্ষিণে যে আশ্চর্য মানুষটি চোখ বুজলেন, তাঁর নাম ছিল পুণ্যলতা চক্রবর্তী, বয়স হয়েছিল ৮৫। তিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা; জ্যেষ্ঠার নাম ছিল সুখলতা রাও; দুজনার মাঝে এক ভাই, তাঁর নাম সুকুমার; পুণ্যলতার পরে দুই ভাই সুবিনয় আর সুবিমল। তাঁদের দুজনার মাঝে শান্তিলতা বলে আরেক বোন ছিলেন, তিনি যৌবনেই মারা গিয়েছিলেন। এখন আর এই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন ভাইবোনদের কেউই বাকি নেই। আছে সুকুমারের ছেলে সত্যজিৎ, সুবিনয়ের রুগ্ন ছেলে সরল, সুখলতার দুটি মেয়ে আর পুণ্যলতার দুই মেয়ে কল্যাণী কার্লেকর ও নলিনী দাশ এবং তাদের ছেলেমেয়েরা।

এঁদের অনেকের নাম এককালে বাংলার শিশুসাহিত্যের জগতে কিংবদন্তীর মতো ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের প্রাচীনতম রচনা পাচ্ছি ১৮৮৫ সালের 'সখা'তে। ছোট একটি প্রবন্ধ, কোনো ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে তার তথ্যও আহরণ করা, কিন্তু আশ্চর্য আধুনিক তার ভাষা। তখন থেকে শুরু করে ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর যখন অকালে

পরলোকে গেলেন, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্য যেন বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়ে, পূর্ণাবয়ব গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাও মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদী কর্মীর চেষ্টায়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর। এঁদের স্নেহচ্ছায়ায় পুণ্যলতা ও তাঁর ভাইবোনেরা মানুষ হয়েছিলেন।

পার্থিব সম্পত্তির মতো প্রতিভাও বংশ পরম্পরায় বর্তায় এ কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারলেও, সেকালের ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামের রায় পরিবারের সন্তানরা যে গান গাইতে, ছড়া কাটতে, সরস কথা বলতে পটু ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পটুত্বই হয়তো তেমন তেমন আবহাওয়া পেলে প্রতিভাতে দাঁড়াতে পারে। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারেও তাই হয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর সহানুভূতিশীল বন্ধুদের সে-সময় একমাত্র প্রয়াস ছিল ছোটদের জন্য বাংলায় ভালো বই বের করতে হবে। তাতে ভালো রচনা ও ভালো ছবি থাকবে। ছাপা ও বাঁধাইও ভালো হবে। এমনি করে বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা বলিষ্ঠ গোড়া-পত্তন হয়েছিল। এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার মধ্যাহ্ন সূর্যও আকাশে দেখা দিয়েছিল।

পুণ্যলতার শৈশব কেটেছিল গান, গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটিকার আবহাওয়ায়। এ-সব জিনিস আগেও কিছু কিছু লেখা হয়েছিল, তখন তার প্রধান উপজীব্য ছিল শিক্ষা। উপেন্দ্রকিশোরের মতো শিল্পীর হাত পড়ে, ছোটদের লেখা হয়ে দাঁড়াল রসাশ্রয়ী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই অসম্ভব-সাধন সম্ভব হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আরো কয়জনের সহযোগিতায়। তখনকার যত শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতরসিক, সবাই এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে জড়ো হতেন। দুধ খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের আলোচনা শুনে শুনে বাড়ির খুদে-খুদে জাত লেখকরা মানুষ হয়েছিল।

সাহিত্য রচনার যেমন কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই, তেমনি কোনো নির্দিষ্ট রূপও নেই। কবিতা মনের মধ্যে যেমনই স্ফুটবে, ঠিক তেমনি প্রকাশ পাবে। জোর করে লেখা যায় না। গল্পের ক্ষেত্র আলাদা। তবু মনে হয় সব শিশুসাহিত্যের বাইরের খোলসগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে, যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছনো যায়, সেখানে দেখা যায় রাজা-রানী পরী-জাদুকর, যোদ্ধা-অভিযাত্রী সবাই সরে দাঁড়িয়েছে, আছে শুধু একটি

উষ্ণ কোমল ঘর, দুটি মানুষ আর দুটি-একটি শিশু আর তাদের চার দিকে কয়েকটি বড় চেনা প্রাণী। সেই নরম গরম কেন্দ্রটি থেকে সব দুঃসাহসিক অভিযানের শুরু আর সেইখানে এসে তাদের শেষ। সব সুখ-দুঃখের কেন্দ্রবিন্দু সেইখানে, সব শক্তির সব আশার উৎস। পুণ্যলতা অতি সহজে তার সন্ধান পেয়ে গেছিলেন। এবং সারাজীবন তাকে মনের মধ্যে লালন করেছিলেন।

বেশি লেখেন নি পুণ্যলতা। সতেরো আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে অবধি বিহারের শহরে শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানেই গেছেন সেখানেই তার হাতে ছোট একটু করে স্নেহের নীড় তৈরি হয়েছে। তার চার দিকে কুকুর, বেড়াল, পায়রা, হাঁস, মুরগি, গোরু-বাছুর, পাখি, মৌমাছি, প্রজাপতি এসেছে গেছে। বছরে বছরে শীতের আগে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে। কিছুই তার নষ্ট হয় নি। সব গিয়ে মনের মধ্যে জমা হয়ে থেকেছে। কত জন্মদিন, কত প্রিয়জনের আগমন, প্রতিদিনকার জীবনের কত স্নেহ, কত ত্যাগ, আবার তেমনি কত লোক, হিংসা, রেষারেষি। কিছু বাদ যায় নি।

পরে যখন অবকাশ হয়েছে একেকটি ছোট গল্প লিখেছেন, তার একটিও মন-গড়া নয়, ঘটনা যাই হোক-না কেন, গল্পের শিকড় হল মনের সেই গহন-গভীরে যেখানে কৃত্রিম কিছু পৌঁছয় না। এইখানে সুখলতার সঙ্গে পুণ্যলতার গল্পের তফাত। সুখলতা দেশ-বিদেশের রূপকথা সংগ্রহ করে তাঁর অনবদ্য ভাষায়, বাঙালী ছেলেমেয়েদের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন, তবে তাতে মৌলিক কিছু নেই। সুখলতার মৌলিক অবদান তাঁর অপূর্ব কবিতায়। দুঃখের বিষয়ে তার বেশির ভাগই পুস্তকাকারে দেখা যায় নি।

পুণ্যলতার জীবনকালে তাঁর লেখা একটিমাত্র বইই প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর অতুলনীয় 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। এই বইতে শুধু উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের কটা বছরের কাহিনী বিধৃত নেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কটা বছর আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলি, তাদের অপরূপ সম্ভাবনীয় ইঙ্গিত নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের সামনে রূপ নেয়। সেইসঙ্গে বাংলার অদ্বিতীয় সুকুমার রায়ের শৈশবের আশ্চর্য এক ছবি পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা বলবার এমন একজন সরস প্রত্যক্ষ-

দশী বাংলায় বিরল। যতদুর মনে হয় হয়তো বছর দশেক আগে যুগান্তর পত্রিকায় পুণ্যলতা একালের শুরুর কথা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছয়-সাতটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই সময় ওঁর স্বামীর অসুখের জন্য লেখা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পরে মনের মতো করে আরেকবার শেষটুকু ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা ছিল। সে আর হয়ে ওঠে নি। মনে হয় প্রবন্ধগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে, দুঃখের বিষয় পরিচ্ছেদগুলি সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি।

যারা পঁচাশি বছর বয়স অবধি পরিপূর্ণরূপে বাঁচতে জানে, তারা জীবনের শেষটুকুও নষ্ট হতে দেয় না। শেষ বয়সে পুণ্যলতার হাতে যখন অশেষ অবসর ছিল, তখন সারা জীবন ধরে জমিয়ে রাখা মনের পরিপূর্ণ ঘটটি থেকে একটি একটি করে রত্ন মাসে মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকাকে উপহার দিয়েছেন। এক পাতার ছোট-ছোট গল্প, প্রাণের রসে ভরা।

সন্দেশের পাতায় আরো অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে। সবগুলি মৌলিক নয়, দেশ-বিদেশের উপকথাও কিছু আছে। কোথাও এতটুকু নীতিশিক্ষা দেবার প্রয়াস নেই। তবু পড়তে পড়তে মনে হয় এই মানুষটি ধনদৌলত বিদ্যা ক্ষমতার ধার ধারে না। এর কাছে সব চাইতে ঘৃণ্য অপরাধ হল লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর সব চাইতে বড় গুণ হল স্নেহ, মমতা, ক্ষমা। ঐ যে গোড়ায় বলা হয়েছিল, সব কাহিনীর খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে যেখানে পৌঁছনো যায়, সেখানে ঐ-সব ছাড়া আর কিসেরই-বা আদর থাকতে পারে।

শুধু গ্রন্থের পরিমাণ দিয়ে সাহিত্যিক হয় না। রসের মৌচাকের মক্ষিরানীকে যে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে, সেই হল জাত-সাহিত্যিক। সেইরকম লেখিকা ছিলেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী। তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে স্নিগ্ধ রসবোধের সমাবেশ হয়েছিল।

পুণ্যলতার একটি ছোটগল্পের উল্লেখ না করে পারছি না। গল্পের নাম, 'কাল বৈশাখী,' ১৩৮০ সালে সন্দেশের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাসুর মা গরিব বিধবা। লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালায়। বাসু স্কুলে পড়ে আর ছোট বোন ফেলিকে আগলায়। একদিন মার বড় কাজ, মুনিব বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, দুপুরে মা বাড়ি

আসবে না। বাসুকে বলে গেছে ফেলিকে দেখতে। ফেলি ঘুমিয়ে পড়েছে, বন্ধুরা ডাকতে এসেছে, অমনি বাসু ছুটে চলে গেছে। খেলার পর ঘরে এসে দেখে ফেলি নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। মা-ও ফিরে এসে দেখে বাড়ি খালি। সে-ও বেরিয়ে পড়েছে। পথে বাসুর সঙ্গে দেখা, দুজনে আকুল হয়ে খুঁজে, শেষে হতাশায় ভেঙে পড়ে থানায় গিয়ে দেখে ফেলি বসে লজেন্‌স খাচ্ছে। সে হামা দিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। পানওয়ালা তাকে অনেকক্ষণ কাছে রেখে, এখন থানায় নিয়ে এসেছে। তখন সকলে কি নিশ্চিন্ত, কি সুখী। বাইরে এসে দেখল, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ কেটে গেছে, নির্মল আকাশে চক্‌চকে চাঁদটাও তাদের দিকে চেয়ে হাসছে। এও তবু বড় গল্প, ছোটদের জন্য ছোট্ট গল্পগুলো আরম্ভ হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়, তারই মধ্যে সব কথা বলা চাই। বাড়তি একটিও শব্দ থাকার অবকাশ নেই,। সাজসজ্জা উপমা অলঙ্কারের জায়গা নেই, চালাকি করে ছেলে ভুলোবার সুযোগ নেই। একটা নমুনা দিই। গল্পের নাম 'আমচোর'।

বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।

একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর 'রাজা' আর 'রানী' তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট্‌ করে আমগাছে উঠে গেল। কুকুর তো গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নীচে থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মতো ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচির্‌ মিচির্‌ করছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুররাও ভাবছে, 'যাবে কোথায় বাছাধন? এক সময় তো নামতেই হবে।' তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রানী একসঙ্গে এক পাতে খায়; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রানী বসে পাহারা দিল। তার পর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রানী খেতে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রানীকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হল। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল।

এইরকম মেজাজেই 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইখানি লেখা, তবে

সেখানি শুধু ছোটদের জন্য নয়। ছোট বড় সবার জন্য। ভাষার একটু নমুনা দিই, 'তখনকার ট্রাম ছিল ঘোড়ায় টানা। আবার খিদিরপুর ও আলিপুরের দিকে ট্রাম ছিল ইঞ্জিনে টানা। যতটা ধোঁয়া ছাড়ত আর শব্দ করত, ততটা জোরে চলত না। তবু ঘোড়ার ট্রামের তুলনায় মনে হত কতই-না তাড়াতাড়ি চলেছি! অমন প্রকাণ্ড ভারী গাড়ি টানতে টানতে বড়-বড় ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তাই খানিক দূর অন্তর ঘোড়া বদল হত। গরমের দিনে ঘোড়ার মাথায় টুপি দেওয়া হত—অনেকটা সোলা হ্যাটের মতো টুপি। কিন্তু ঘাড়ের দিকে অনেকখানি লম্বা। টুপির দুই ধারে দুই ফুটো—তার মধ্যে দিয়ে কান দুটো বেরিয়ে থাকত।'

এইরকম লিখতেন পুণ্যলতা, সবার কথার নীচে প্রচ্ছন্ন একটা হাসির স্রোত বইত। কচিৎ কলকল করে সেই স্রোত সূর্যের আলোর টানে নিজেকে দমন করতে না পেরে আত্মপ্রকাশ করত। অবিস্মরণীয় দুই ছত্র দিচ্ছি—

"বুড়ো বললি কোন্ আক্কেলে,
বুড়ো কি হয় দাড়ি পাক্‌লে?"

যে-গাছে সুকুমার ফুটেছিলেন, সেই গাছেরই ফুল।